কেন্দ্রীয় সালেক প্রশিক্ষণ

কর্মশালা ২০২০

সালাফী আন্দোলন দেশে দেশে

ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহতিসাব

ICT Tools for Da`wah & Communication

পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা

দারসুল কুরআন

জঙ্গিবাদ : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সঠিক পরিকল্পনা: কাজ সুসম্পন্নের অর্ধেক

দ্বীন প্রচারে নবী-রাসুল (সাঃ) দের সংগ্রামী জীবন

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

info.shubbanbd@gmail.com

www.shubbanbd.org

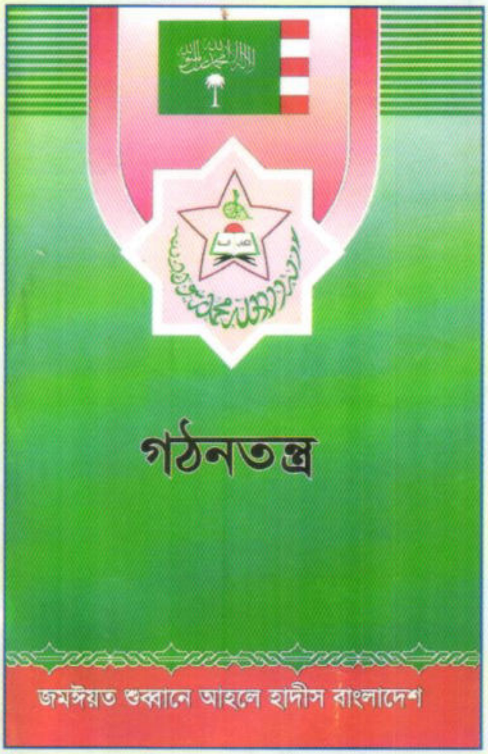
গঠনতন্ত্র
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

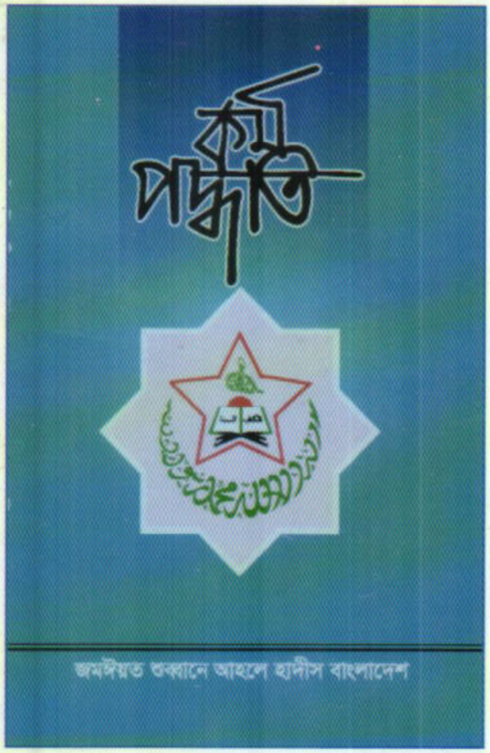
কর্ম পদ্ধতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

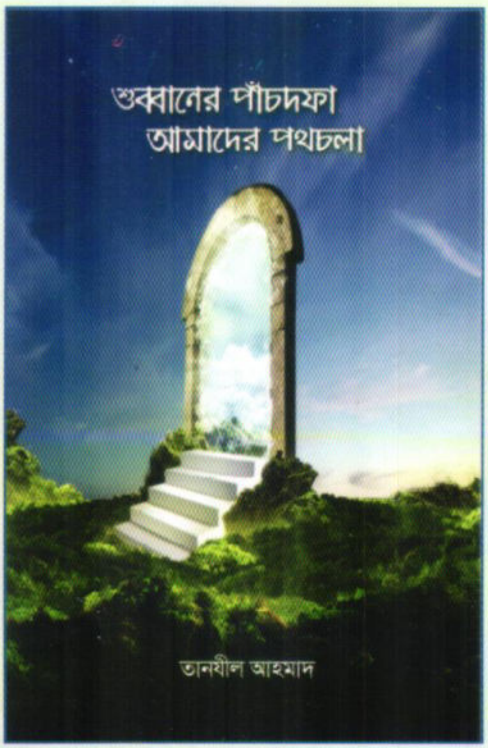
শুব্বানের পাঁচদফা
আমাদের পথচলা
তানযীল আহমাদ

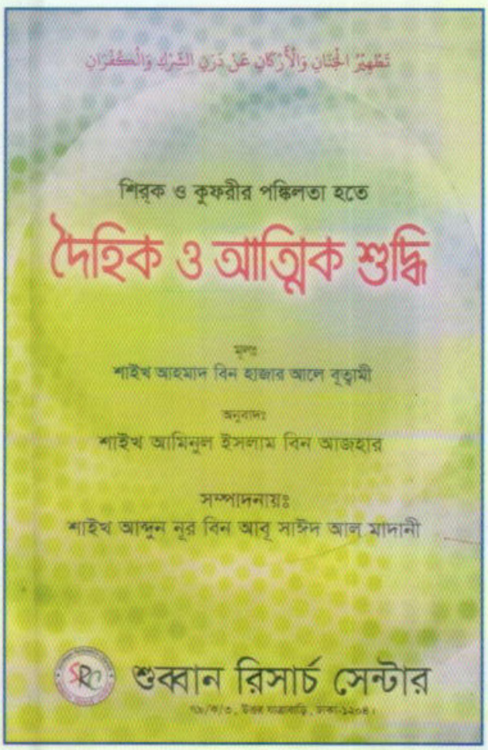
شيرك و كفرير पঙ্কिलতা
শিরক ও কুফরীর পঙ্কিলতা হতে
দৈহিক ও আত্মিক শুদ্ধি
মূলঃ
শাইখ আহমাদ বিন হাজার আলে বূত্বামী
অনুবাদঃ
শাইখ আমিনুল ইসলাম বিন আজহার
সম্পাদনায়ঃ
শাইখ আব্দুন নূর বিন আবূ সাঈদ আল মাদানী
শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

কেন্দ্রীয় সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২০

ICT Tools for Da`wah & Communication

পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা

সালাফী আন্দোলন দেশে দেশে

ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহতিসাব

দারসুল কুরআন

জঙ্গিবাদ : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সঠিক পরিকল্পনা: কাজ সুসম্পন্নের অর্ধেক

দ্বীন প্রচারে নবী-রাসূল (সাঃ) দের সংগ্রামী জীবন

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
info.shubbanbd@gmail.com
www.shubbanbd.org

কেন্দ্রীয় সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২০

প্রধান সম্পাদক	ঃ	মোঃ রেজাউল ইসলাম
সম্পাদক	ঃ	মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
সম্পাদনা পরিষদ	ঃ	তানযীল আহমাদ আব্দুল মতিন রবিউল ইসলাম রায়হান কবির আশিক বিন-আশরাফ
প্রকাশনায়	ঃ	শুব্বান রিসার্চ সেন্টার
প্রকাশকাল	ঃ	৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	ঃ	মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
ডিজাইন ও মুদ্রণ	ঃ	পিক্সেল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স ৫১/৫১ এ, রিসোর্সফুল পল্টন সিটি পুরানা পল্টন, ঢাকা। ০১৭৫৭-৬৭২৬৯৬

সূচিপত্র

১.	বাণী-	
	উদ্বোধক	০৪
	শুব্বান পরিচালক	০৫
	শুব্বান সভাপতি	০৬
২.	সম্পাদকীয়	০৭
৩.	প্রশিক্ষকবৃন্দ	০৮
৪.	প্রশিক্ষাণার্থী	০৯
৫.	দারসুল কুরআন	১১
৬.	সালাফী আন্দোলন দেশে দেশে	১২
৭.	দ্বীন প্রচারে নবী রাসূলদের সংগ্রামী জীবন	১৭
৮.	ক্যারিয়ার গাইড লাইন (সঠিক পরিকল্পনা: কাজ সুসম্পন্নের অর্ধেক)	৩১
৯.	ICT Tools for Dawah and communication	৩৪
১০.	জঙ্গিবাদ: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৪০
১১.	ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহতিসাব	৪৩
১২.	পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা	৫৩
১৩.	মজলিসে শুরার পরিচিতি	৫৫

মাননীয় উদ্বোধকের বাণী

আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াস সলাতু ওয়াআস সালামু 'আলা মাল্লা নাবিয়্যা বা'দা।

আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, কেন্দ্রীয় শুব্বান দু'দিনব্যাপী সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২০ উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশ করছে। কেবল একটি কর্মশালাকে কেন্দ্র করে স্মারক প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এ স্মারক আমাদের অর্জনকে কেবল আনন্দিতই করবে না, বরং তা আগামী প্রজন্মের জন্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

সূচনালগ্ন থেকেই আমি শুব্বানের সুখ-দুঃখের সাথী। তাদের প্রতিটি সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক কাজ আমাকে স্পর্শ করে; তাই তাদের জন্য আমার প্রাণোৎসারিত দু'আও সার্বক্ষণিক।

হে দয়াময় আল্লাহ! তুমি শুব্বানকে আগামীর জমঈয়তের কাণ্ডারী হিসেবে কবূল করো। আমীন।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর দু'দিনব্যাপী সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২০ সাফল্য কামনায়–

প্রফেসর ডাঃ দেওয়ান আব্দুর রহীম
সহ সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

শুব্বান পরিচালকের বাণী

নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লি আলা রসূলিহিল কারিম আম্মা বা'দ।

তাওহীদি যুব কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সাংগঠনিক ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছাত্র ও যুব সমাজের জন্য এরকম প্রশিক্ষণের আয়োজন খুবই প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহর যোগ্য নেতৃত্বের মহাসংকটাপূর্ণ এই মুহূর্তে এমন প্রশিক্ষণ ইসলামি নেতৃত্বের খরা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক নববী আদর্শের সফল প্রতিচ্ছবিসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে যুব সমাজকে সঠিক পরিচর্যা, যথাযথ দিকনির্দেশনা ও তাদের আবেগ এবং কোমল অনুভূতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা, ব্যাপক স্টাডি, ঘন ঘন প্রশিক্ষণ আয়োজন, পাঠচক্র, আনুগত্য ও ইহতিসাব কার্যকরি ভূমিকা রাখবে। সকল প্রশিক্ষকবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী ও আয়োজক কমিটিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কর্মশালাকে মলাটবদ্ধ করে রাখার জন্য প্রশিক্ষণ স্মারক প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ। কর্মীদেরকে উৎসাহ যোগাতে তা ফলপ্রসূ হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের নেক আমলগুলো কবূল করুন-আমিন।

মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীন
শুব্বান পরিচালক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

সভাপতি মহোদয়ের বাণী

সকল প্রশংসা মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার জন্য। হে আল্লাহ আপনি শান্তিতে রাখুন আপনার প্রিয় রাসূল, মহান শিক্ষক ও আমাদের প্রিয় নবীজিকে। বেশ কয়েক দিনের প্রচেষ্টায় শুব্বান ভাইয়েরা দুই দিন ব্যাপি একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পেরেছে- আলহামদুলিল্লাহ।

প্রকৃতপক্ষে আমরা একটি অসীম সময় রেখার মাত্র কয়েক বিন্দু এই দুনিয়ায় অবস্থান করি। নবীজির দেখানো শেষ বিকেলের মুহূর্ত বা আখেরাতে মানুষের উপলব্ধি মতে, মাত্র এক সকাল বা বিকেল পরিমাণই কেবল আমরা দুনিয়ার পরীক্ষা কেন্দ্রে অবস্থান করি। অথচ এই সামান্য সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তের কার্যকর ও অকার্যকর ব্যবহারের ওপরেই আমাদের অসীম সময়ের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী,

বয়স অনুপাতে এই সময়ে আমরা আমাদের জীবনের প্রায় মধ্যাকাশে আছি। গাছপালা ও প্রাণীকূলের উপর মধ্যাকাশের তেজোদ্দীপ্ত সুর্যের প্রভাবের ন্যায় আমাদের সমাজ জীবনে তারুণ্যের চিন্তা ও কাজের গভীর প্রভাব রয়েছে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের পাঁচদফা কর্মসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল আত তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ। নিজেকে গুছিয়ে নিতে না পারলে, প্রশিক্ষিত না করলে অতি মূল্যবান ও খুবই ক্ষণস্থায়ী এই সময়ের এক মুহূর্তের অপচয় ও অসতর্কতা আমার অন্ধকার ভবিষ্যত গড়ে দিতে পারে। এলোপাথারি হাজার কাজের চেয়ে সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সামান্য কাজেরও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

আমাদের নেতা কর্মীদের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক মূল্যবোধ ও দক্ষতার মানোন্নয়ন ঘটানো আমাদের অগ্রাধিকার কর্মক্ষেত্র। শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর পাঁচদফা কর্মসূচীর অন্যতম। ভয় ছড়িয়ে, হতাশা বাড়িয়ে, গাফেল বানিয়ে, আলস্য বিস্তার করে আমাদের চিরশত্রু শয়তান আমাদেরকে সততঃ উদ্যোমহীন দেখতে চায়।

দ্বীনের বন্ধুগণ,

আজকের এই প্রশিক্ষণে চমৎকার সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষকদের মধ্যে নবীন ও প্রবীনের সমন্বয় রয়েছে। ইতোমধ্যে, গত বছরে আমরা দেশব্যাপী জোন ও জেলা ভিত্তিক অনেকগুলো প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছি। ২০২০ সালে ইনশাআল্লাহ সকল জেলায় প্রশিক্ষণ আয়োজিত হবে। এবারের প্রশিক্ষণকে রোল মডেল করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে একটি স্মারক প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আসন্ন জেলা প্রশিক্ষণগুলোতে এটির ব্যবহার ফলদায়ক হতে পারে। বিভিন্ন পর্যায়ে সাবেক শুব্বান ভাইয়েরা, মজলিসে আম ও কারারের দায়িত্বশীলবৃন্দ, শাখা পর্যায়ের কর্মী ও দায়িত্বশীল, শেকড় এবং শুব্বান রিসার্চ সেন্টারের সদস্যবৃন্দ স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে আমাদের এই আয়োজনে ভূমিকা পালন করেছেন। সারাদেশ থেকে কর্মব্যস্ততা উপেক্ষা করে শুব্বানের অগ্রসর মানের নেতা কর্মী ত্যাগ স্বীকার করে এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন।

হে আল্লাহ! প্রত্যেকের চেষ্টাকে তোমার পথে জিহাদের মর্যাদায় উন্নীত করে সকলকে উত্তম প্রতিদান দিও। হে রব, সমাজ মানসের শিরক-বিদ'আত হতে মুক্তি ঘটাও। যুব সমাজকে তোমার ইবাদতে মশগুল কর। কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াহ প্রসারে, এই দেশ ও জাতির উন্নয়নে শুব্বানকে ইতিবাচক ধারায় অবদান রাখার সক্ষমতা বাড়িয়ে দাও। আমীন।

মোঃ রেজাউল ইসলাম
সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

সম্পাদকীয়

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর তৃতীয় স্তরের কর্মী সালেকদেরকে নিয়ে আয়োজিত দুই দিনব্যাপি সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২০ উপলক্ষে স্মারক প্রকাশ করতে পারায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি-আলহামদুলিল্লাহ। ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণের বিষয়াবলী মলাটবদ্ধ করার সদিচ্ছা নিয়ে বহু কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এবার মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী অতঃপর প্রশিক্ষকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা ও স্মারক প্রকাশ কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রশিক্ষণ স্মারক দিনের আলোয় মুখ দেখতে পারছে-আলহামদুলিল্লাহ।

শুব্বানের পাঁচদফা কর্মসূচির চতুর্থ দফা আত তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ। যে কোন আদর্শ সংগঠন ও কর্মীর জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। বিশেষতঃ সাংগঠনিক কর্মসূচি সূচারুনরূপে বাস্তবায়নে, দ্বীনি দাওয়াতকে যুগোপযুগী ও গতিশীল করতে, সাংগঠনিক চেতনা জাগরুক করতে সর্বোপরি, একজন কর্মীকে যোগ্য, ত্যাগী, আদর্শিক ও ডায়নামিক করতে প্রশিক্ষণ সহায়কা ভূমিকা পালন করে। ইসলামের কালজয়ী সভ্যতা বিনির্মাণে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের সুমহান আদর্শ, ইনসাফ, মানবতা ও মহানুভবতাকে প্রচার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাবী সাঃ একদল নিষ্ঠাবান, আত্মত্যাগী, কর্মঠ ও সাহসী বীরপুরুষকে নিজ হাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মিদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনায়, তাদের জীবনকে সুন্দর ও সজ্জিত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। অথচ ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।" সূরা আল জুমুআ, ৬২/২।

একবিংশ শতাব্দীর কঠিন এই সময়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের সামনে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী মহল যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে, বাস্তবতা হলো, জাহেলিয়াতের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিমদের প্রস্তুতি অনেকাংশেই পর্যাপ্ত নয়। আমাদের অবস্থান আরো দুর্বল বলেই প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সঠিক উপায়, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারেও আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত মহলে, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বিশাল ছাত্রসমাজের মাঝে আমাদের দাওয়াতের মাত্রা ও প্রস্তুতি খুব বেশি নয়। এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে এবারের আয়োজিত দুই দিনব্যাপি সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বেশ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী। যারা প্রশিক্ষণে ইচ্ছা থাকা সত্বেও উপস্থিত থাকতে পারে নি, প্রশিক্ষণ স্মারকটি তাদের সেই অপূর্ণাঙ্গতা পূরণ করবে-ইনশাল্লাহ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সম্মানিত প্রশিক্ষকবৃন্দের; যারা শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের প্রদেয় প্রশিক্ষণের ক্লাসগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও লিখিত আকারে দিয়ে স্মারক প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। স্মারক প্রকাশ কমিটির সকল সদস্যকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তাদের আন্তরিক শ্রম ও মেধা ব্যয় করার জন্য। অতঃপর অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীকে শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং দ্বীনী কাজে এই প্রশিক্ষণ ও স্মারক আমাদের সকলকে উজ্জীবিত করবে বলে আশা ব্যক্ত করছি।

মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে তার মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলাম পালন ও প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালনের তাওফিক দেন-আমিন।

প্রশিক্ষকবৃন্দ

১. **প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম**
উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
এবং প্রাক্তন অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২. **শাইখ মোস্তফা বিন বাহরুদ্দিন সালাফী**
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

৩. **শাইখ শহীদুল্লাহ খান মাদানি**
সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
প্রিন্সিপাল, মাদরাসাতুল হাদীস নাযির বাজার, ঢাকা।

৪. **উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর**
যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
সাবেক উপাধ্যক্ষ, শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজ, সাতক্ষীরা।

৫. **শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন**
প্রচার-প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
পরিচালক, জামি'আ দারুল হাদীস আল আরাবিয়া, গাজিপুর, ঢাকা।

৬. **শাইখ মুহাঃ আব্দুল মাতীন**
শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস,
সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও
প্রভাষক, তানোর মহিলা ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী।

৭. **অধ্যাপক ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ**
সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. **মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ**
পিএইচডি গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ,
সহকারী অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৯. **মোঃ আরিফুল ইসলাম অপু**
সহকারী অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. **মোঃ রেজাউল ইসলাম**
সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও
সিনিয়র অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

১১. **শাইখ আব্দুল হালিম মাদানী**
মুহাদ্দিস, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

প্রশিক্ষণার্থী

দিনাজপুর জোন

ক্র: নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম
১.	দেলওয়ার হোসেন
২.	এন্তাজুল ইসলাম
৩.	তাওহীদুল ইসলাম
৪.	বুরহান উদ্দীন
৫.	ইবরাহীম
৬.	শামসুল
৭.	মুহসিন
৮.	ইয়াসিন
৯.	তানযীমুল বারী
১০.	মহসিন হোসেন

রংপুর জোন

১.	আঃ রহমান
২.	আতিকুল ইসলাম
৩.	মোঃ নাসিমুল হক
৪.	শহিদুল্লাহ
৫.	আঃ ওয়াজেদ
৬.	আঃ আলিম
৭.	মামুনুর রশিদ
৮.	রুহুল আমিন
৯.	মুনিরুজ্জামান
১০.	সানোয়ার হোসেন
১১.	জহিরুল ইসলাম

বগুড়া জোন

১.	নাজির আহমাদ
২.	আব্দুর রউফ
৩.	নুরুল ইসলাম
৪.	রবিউল ইস. রানা
৫.	হাঃ রুবেল
৬.	শফিকুল ইসলাম
৭.	আবুল ফজল
৮.	আমিনুল ইসলাম
৯.	আতিকুর রহমান
১০.	আঃ গাফ্ফার
১১.	সাকিব হোসেন
১২.	মেহের হোসেন
১৩.	রেজওয়ান হোসেন
১৪.	আসাদুল্লাহ
১৫.	সাগর হোসেন
১৬.	আব্দুর কাদের
১৭.	ইউসুফ
১৮.	আবুল হাসেম
১৯.	আরিফুল ইসলাম

রাজশাহী জোন

১.	আকবর আলী
২.	জিয়াউর রহমান
৩.	আবু সাইদ
৪.	আমিনুল ইসলাম
৫.	যোবায়ের হোসেন
৬.	সুয়াবুর রহমান
৭.	শহিদুল্লাহ
৮.	আব্দুল্লাহ
৯.	মিনহাজুল ইসলাম
১০.	নুরুল ইসলাম
১১.	ওয়ালিউল্লাহ
১২.	মুজিবুর রহমান
১৩.	সাদ্দাম হোসেন
১৪.	হাফিজুর রহমান

যশোর জোন

১.	শাহিনুর রহমান
২.	মরতুজা আলী
৩.	আব্দুর রাকিব
৪.	আব্দুল আহাদ
৫.	আসাদুল্লাহ
৬.	আল-আমিন
৭.	মাসুদুর রহমান
৮.	সাকিবুল হাসান
৯.	শফিকুল ইসলাম
১০.	হোসাইন আল কিবরিয়া
১১.	তাওহীদুজ্জামান
১২.	গালিব হোসেন
১৩.	হা:ইমরান হুসাইন

ময়মনসিংহ জোন

১.	জামালউদ্দীন সালাফী
২.	হাবিবুর রহমান বাদশা
৩.	এহসানুল হক
৪.	হাবিবুর রহমান
৫.	হাফিজুল ইসলাম
৬.	আ.ব.ম মাহমুদুল হাসান
৭.	আল আমীন

নরসিংদী জোন

১.	কামরুজ্জামান
২.	ইয়াসিন
৩.	জহির
৪.	ক্বারী ইলিয়াস
৫.	সাইফুল ইসলাম
৬.	নাজিমুদ্দীন
৭.	মোজিবুর রহমান
৮.	মাহবুবল আলম
৯.	শাহীন আলম
১০.	আব্দুল ওয়াহীদ
১১.	রফিকুল ইসলাম
১২.	রাকিবুল ইসলাম
১৩.	শামীম আহমাদ
১৪.	হাবিবুর রহমান
১৫.	আশরাফুল ইস:
১৬.	আইনুল বারী ফরাযী

ঢাকা জোন

১.	হা ওয়াসিম উদ্দীন সজিব
২.	আঃ মালেক আহমাদ মাদানি
৩.	আবু বকর ইসহাক
৪.	হেদায়াতুল্লাহ
৫.	আব্দুল করিম
৬.	হাফেয খালিদ হাসান
৭.	মুহাম্মদ রনি
৮.	শরিফুল ইসলাম
৯.	ফরিদুল ইসলাম
১০.	হাসান আলী
১১.	মো: মশিউর রহমান
১২.	মো: শাহ আলম
১৩.	নবাব
১৪.	মুহাম্মদ বিন রশিদ
১৫.	ওমর ফারুক
১৬.	শিহাবুদ্দিন
১৭.	আশরাফ
১৮.	আবু লায়েছ
১৯.	রুহুল আমিন
২০.	আব্দুল কাইয়ুম
২১.	আব্দুল আউয়াল
২২.	আব্দুল হাফিজ
২৩.	সাদিকুল ইসলাম
২৪.	মাসুম বিল্লাহ
২৫.	নাজমুল হোসেন
২৬.	ইসমাইল হোসেন
২৭.	নুর হাসান
২৮.	কাউসার মাহমুদ
২৯.	সাইদুর রহমান
৩০.	মাহমুদুল হাসান
৩১.	ফরমান আলী
৩২.	আব্দুর রহমান বিন জামিল
৩৩.	মুনির আল গানাভী
৩৪.	মতিউর রহমান
৩৫.	মুহাম্মাদ আলী
৩৬.	তানভীর আহমাদ
৩৭.	মুহসিন আলী
৩৮.	আবু সাঈদ
৩৯.	যোবায়ের আহমাদ
৪০.	সেলিম রেজা
৪১.	তাজিবুল ইসলাম
৪২.	সালামন তারেক
৪৩.	হাসিবুল আলম
৪৪.	সাকিব খাঁন
৪৫.	মাহাদী হাসান আরিফ
৪৬.	আবুল কালাম
৪৭.	আরিফুল ইসালাম
৪৮.	খালিদ দেওয়ান
৪৯.	আব্দুল বাকী
৫০.	ইমরান সামদানী
৫১.	রবিউল ইসলাম
৫২.	মাহদী বিন আমিনুল
৫৩.	হাঃ কামালউদ্দীন
৫৪.	নাহিদ হাসান
৫৫.	জুবায়ের আহমাদ
৫৬.	আব্দুল বাকী

জোনের আওতামুক্ত

১.	আবুল ফযল আব্বাস
২.	আব্দুস সালাম
৩.	নাজমুস সাদাত
৪.	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
৫.	খন্দকার রিয়াজুল
৬.	হাসিবুল ইসলাম
৭.	এহসানুল হক

দারসুল কুরআন

শাইখ মোস্তফা বিন বাহরুদ্দিন সালাফী

মহান আল্লাহ বলেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

''মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গীকার পূর্ণ করে) মারা গেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। যাতে আল্লাহ পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং শাস্তি দেন মুনাফিকদেরকে যদি তিনি চান অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'' (*সূরা আল-আহযাব ৩৩/২৩*)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ» ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ، - يَعْنِي المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ» ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ» ، قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ، قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ قَالَ أَنَسٌ: "كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

'আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনু নাযার রাযি. বদরের যুদ্ধের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের সঙ্গে আপনি প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, আমি সেসময় অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে শরীক হবার সুযোগ দেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখতে পাবেন যে, আমি কী করি। অতঃপর উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে আনাস ইবনু নাযার রাযি. বলেছিলেন, আল্লাহ! এঁরা অর্থাৎ, তার সাহাবীরা যা করেছেন, তার সম্বন্ধে আপনার নিকট ওযর পেশ করছি এবং এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করছি।

অতঃপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং সা'দ ইবনু মুয়াযের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিন বললেন, হে সা'দ, (আমার কাম্য) নাযারের রবের কসম, উহুদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি।

সা'দ রাযি. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি যা করেছেন তা আমি করতে পারিনি। আনাস রাযি. বললেন, আমরা তাকে এমতাবস্থায় পেয়েছি যে, তার দেহে আশিটিরও অধিক তলোয়ার, বর্শা ও তীরের যখম রয়েছে। আমরা তাকে নিহত অবস্থায় পেলাম। মুশরিকরা তার দেহ বিকৃত করে দিয়েছিল। তার বোন ব্যতীত কেউ তাকে চিনতে পারেনি এবং তার বোন তার আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছিল। আনাস রাযি. বলেন, আমাদের ধারণা কুরআনের এই আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর মত মু'মিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

"মুমিনদের মধ্যে হতে কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। (*সহীহ বুখারী হা: ২৮০৫*)

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ، فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا وَضَعْنَاهُ على رجليه / خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ،

খাব্বাব বিন আরাত রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে হিজরত করেছিলাম। ফলে আল্লাহর কাছে আমাদের পুরস্কার লিখিত হয়ে গেছে। আমাদের কতক দুনিয়াতে কোন পুরস্কার ভোগ না করেই অতীত হয়ে গেছেন। মুস'আব ইবনু উমাইর রাযি. তাদের একজন। তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। তিনি একটি পাড় বিশিষ্ট পশমী বস্ত্র ব্যতীত আর কিছু রেখে যাননি। এ দিয়ে আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে তার মাথা বের হয়ে যেত। তখন নবী (সা) বললেন, এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং ইযখির দ্বারা তার পা ঢেকে দাও। (*সহীহ বুখারী হা: ৪০৪৭*)

সালাফী আন্দোলন দেশে দেশে
একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম

পাক ভারত উপমহাদেশে আহলুল হাদীস পরিভাষাটি মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে 'সালাফী' নামে পরিচিত। এ ছাড়াও 'আনসারুস সুন্নাহ' বা 'মুহাম্মাদী জামা'আত' নামেও কোন কোন দেশে কিছু মানুষ পরিচিত।
'আহল' শব্দের অর্থ: আহলুল ইলম- বিদ্বান, জ্ঞানী।
আহলুত তাকওয়াহ- মুত্তাকী
আহলুল বায়ত- রাসূলুল্লাহর পরিবার ও বংশধর।
হাদীসের অনুসারীগণ ভারতীয় উপমহাদেশে আহলে হাদীস বা আহলুল হাদীস নামে পরিচিত। অভিধানে হাদীস অর্থ কথা, বাণী। ইসলামী পরিভাষায়, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কথা, বাণী, আদেশ, নির্দেশ সবই হাদীস।
পবিত্র কুরআনে হাদীস শব্দটি বহু স্থানে এসেছে। "আল্লাহু নাযযালা আহসানাল হাদীস"- আল্লাহ উত্তম বাণী নাযিল করেছেন। "ফাবি আইয়ে হাদীসিন বা'দাহু ইউমিনূন"- অতঃপর তারা আর কোন্ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? রাসূলুল্লাহ (সা:) তার কোন কোন স্ত্রীর সংগে গোপনে কথা বলেছেন সূরা তাহরিমে তার উল্লেখ এভাবে এসেছে: "ইয আসার্রান নাবিউ ইলা বা'জি আযওয়াজিহি হাদীসা"। (তাহরীম : ৩)
খাইরুল কুরূন বা ইসলামের উত্তম যুগসমূহে (সাহাবা, তাবিঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগে) সকলেই কুরআন হাদীস ছাড়া আর অন্য কিছুকে অনুমোদন করতেন না। এমন কি মাযহাব সৃষ্টির পূর্বে মহামতি ইমামগণও আহলুল হাদীস বা সালাফী ছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীসটি দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় আহলুল হাদীস পরিভাষাটি তখনও চালু ছিল।
আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, কেয়ামত দিবসে আহলে হাদীসরা উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, তাদের হাতে থাকবে লেখার কালির দোয়াত। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলবেন তোমরা আহলুল হাদীস সরাসরি জান্নাতে চলে যাও। (তাবারানী)
আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী আহলে হাদীসের আকীদা বর্ণনা করেছেন এভাবে- তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা, ছোটবড় সব সৃষ্টিই আল্লাহর। আল্লাহর আদেশের বাইরে কোন সৃষ্টিই নেই।
"আল্লাহ মহান, যার মুঠোয় রয়েছে সবকিছুর কর্তৃত্ব, তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান।" (সূরা মূলক: ১)
হে রাসূল! মুশরিকদের জিজ্ঞেস কর কে আছে এমন যার কর্তৃত্বাধীন সব কিছু? যিনি সবকিছুকেই আশ্রয় দেন এবং যার উপর কারও কোন কর্তৃত্ব নেই। তোমরা যদি জান তবে সঠিক উত্তর দাও। তারা অচিরেই বলবে এমন শক্তি ও সামর্থের মালিক কেবল আল্লাহ। (আল মুমিনুন: ৮৮-৮৯)
পবিত্র কুরআনে এই মর্মে আরও অনেক আয়াত আছে। এ ছাড়া তাওহীদের কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মমার্থও তাই। কেবল আল্লাহই হলেন উপাস্য এবং সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর দাস ও আজ্ঞাবহ।
হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুসলমানদের পরিচয়ের জন্য কোন নামের প্রয়োজন হত না।

যদিও এ সোনালী যুগের মানুষদের মাঝে বহু বিষয়ে পারস্পরিক মতানৈক্য ছিল। তথাপি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতেন।

আহলুল হাদীস বা সালাফী কারা?

সালাফ হল যারা কিতাব-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং এই দুই মূল উৎসকে অন্য সকল মত ও পথের উপর প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের আদর্শ অনুসরণ করে তা আকীদা, ইবাদত ও মুআমালাত, আখলাক, রাজনীতি, সমাজনীতি যে কোন ক্ষেত্রেই তারা মহান আল্লাহ ও তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) এর প্রতি নাযিলকৃত ওহীর উপর অবিচল থাকে এবং মানুষকে এ পথেই আহ্বানে তৎপর থাকে বা দায়িত্ব পালন করে থাকে। তারা নবী (সা:) থেকে লব্ধ ইলম অন্যের নিকট পৌছানোর দায়িত্ব পালনে চরমপন্থীদের অনভিপ্রেত পরিবর্তন বা বাতিলপন্থীদের অন্যায় সংযোজন এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা প্রতিহত করে।

আহলে হাদীসগণ বাতিলপন্থী জাহমিয়া, মু'তাযিলা, খারেজী, রাফেযী, মুরজিয়া ও কাদারিয়া বা অনুরূপ অন্যান্যদের অনিষ্ট থেকে সর্বদা সতর্ক থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে নিন্দুকের নিন্দা কখনও স্পর্শ করে না- আলহামদুলিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাদীস- আমার উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কোন নিন্দুকের নিন্দা, বিরুদ্ধবাদীর বিরোধিতা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীদের আদর্শের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ৭৩ দলে উম্মতে মুহাম্মাদী বিভক্ত হবে তার মধ্যে কেবল একটি দলই নাজাত প্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহর এই ভবিষ্যত বাণী শুনে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, কারা সেই নাজাতপ্রাপ্ত দল? উত্তরে রাসূল (সা:) বলেন: আমি ও আমার সাহাবাগণ যে নীতি ও আদর্শের উপর অটল, তারা।

আহলে হাদীসগণের নীতিসমূহের অন্যতম হল কুরআন সুন্নাহর উপস্থিতিতে তারা অন্য কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। পৃথিবীতে শত সহস্র উত্থান পতন হয়েছে ও হবে, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর নীতি আদর্শে কোন ব্যত্যয় ঘটবে না, বরং সৃষ্টি রহস্যের নতুন নতুন আবিষ্কারে পৃথিবীর মানুষ আরও আল্লাহমুখী হবে এবং শিরক বিদআতের অসারতা পরিস্ফুটিত হতেই থাকবে ইনশা আল্লাহ।

একদিন পবিত্র কুরআনের আলোতে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ হেদায়েতের পথ পাবে, আল্লাহর নূর পরিপূর্ণতা পাবে, একটা শক্তিশালী উম্মত হিসেবে মুসলিম জাতি প্রতিষ্ঠা পাবে এর পূর্বাভাষ বইতে শুরু করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার সরকারগুলো সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের নির্মূল করার চক্রান্তে লিপ্ত হলেও সর্বত্র গণ মানুষের ইসলামপ্রীতি অস্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলছে। আমেরিকা ও ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে দিন দিন মুসলমান বেড়েই চলেছে। আজ খোদ ইসরাইলের অভ্যন্তরে এক প্রভাবশালী পরিবারের সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করে চমক সৃষ্টি করছে। যদিও নও মুসলিমদের অনেকেই সালাফী মানহাজ পায়নি। আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি কোন দেশে সালাফী মানহাজ কীভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

বাংলাদেশ- পৃথিবীর সবচে' বেশী সালাফী রয়েছে বাংলাদেশে। মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মানুষ সালাফী মতাদর্শে বিশ্বাসী। সালাফীদের অধিকাংশই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অনুসারী। এ দেশে মূল সংগঠনের বাইরেও অঞ্চল বিশেষে আরও কয়েকটি সালাফী সংগঠন তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়াও সহীহ আকীদার অনুসারী নামে বেশ কিছু মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা কিতাব-সুন্নাহর আমল প্রচারে সক্রিয় রয়েছেন। পঞ্চাশ বছর পূর্বে

বা আরো আগে হানাফী ও সালাফীদের বাহাস মুবাহাসাতে পারস্পরিক চরিত্র হনন চালু ছিল যা বর্তমানে অনেকটা কমে আসছে।

এর অন্যতম কারণ হল, বিগত বছরগুলোতে এ দেশে বহুসংখ্যক ছাত্র সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ, ইউটিউবে সালাফী পণ্ডিতদের লেকচার শ্রবণ, সৌদি আরবসহ আরব দেশের সালাফী সংগঠনের দায়িত্বশীলরা বিভিন্ন উপলক্ষে বাংলাদেশে এসে মাসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠাসহ নানাবিধ কারণ। অনেকেই আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেও সহীহ আকীদা প্রচারে ভূমিকা রাখছেন। বিগত ১৫ বছরে ঢাকা শহরে সালাফীদের বহু মসজিদ গড়ে উঠেছে। মাশা আল্লাহ। সালাফী মানহাজ এর দাঈ এখন অগণিত।

ভারত: পাক ভারত উপমহাদেশের দেশসমূহে সালাফীদের সংখ্যা বৃটিশ আমলেও ছিল এবং বর্তমানে হিন্দুস্তানের সব শহর ও গ্রামাঞ্চলে অগণিত সালাফী সমর্থক রয়েছেন, তবে কোলকাতা, দিল্লী ও মুম্বাইয়ে সালাফী সংগঠনের শক্ত ঘাটি রয়েছে। এই সংগঠনের অসংখ্য উঁচু মানের মাদরাসা রয়েছে তবে তুলনামূলকভাবে পাকিস্তান এ ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে।

পাকিস্তান: পাকিস্তান মারকাযী জমঈয়তে আহলে হাদীসের সদর সফতর লাহোরে অবস্থিত। ২০০৮ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমঈয়তে একটি কনফারেন্স যোগদান করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।

সেই সফরে করাচী, লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি এবং আজাদ কাশ্মীরে ১৪ দিনের একটি স্মরণীয় সফর হয়েছিল আমার। জামেয়া মিল্লিয়া সহ বহু প্রতিষ্ঠান এবং সালাফী ব্যক্তিবর্গ ও মাশায়েখদের সংগে আমি সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। পাকিস্তানের সালাফীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংগঠনের বাইরে ছোট ছোট দল আছে তবে সবাই কেন্দ্রকে সহযোগিতা করে, সকলকে কেন্দ্রীয় জমঈয়তকে সুদৃঢ় করতে ইচ্ছুক মনে হয়েছে।

আজাদ কাশ্মীর- এখানে লোক সংখ্যার তুলনায় আহলে হাদীস কম। তবে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ মনে হয়েছে।

রাসূল (সা:) এর যুগ থেকে শুরু করে প্রায় সব যুগেই কিতাব সুন্নাহর উপর আমল এর গুরুত্ব লক্ষণীয়। প্রচলিত মাযহাবসমূহ সৃষ্টির পূর্বের যামানার মানুষেরা সকলেই উত্তম যুগের মানুষদের অনুসরণ করতেন এবং নিজেরা সালাফী নামে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন। সাহাবাগণ ও তাদের অনুসারীগণের অনেকেই নিজেদের আহলুল হাদীস বলতেন বলে উক্তি পাওয়া যায়।

সাহাবায়ে কেরাম যে সকল দেশ ও অঞ্চল বিজয় করেন তারা আহলে হাদীস নামে অভিহিত ছিলেন।

আবু মানসুর আব্দুল কাদের বিন তাহির তাইমী আল বাগদাদী তার বিখ্যাত কিতাব উসুল আদ দীনে উল্লেখ করেন:

'রোম, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান এবং বাবুল আবওয়াব প্রভৃতি স্থানের মুসলিম উপনিবেশসমূহের অধিবাসীবৃন্দ আহলে হাদীস মতবাদের অনুসারী ছিলেন। ঐরূপ আফ্রিকা, স্পেন এবং পশ্চিম সাগরের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সমুদয় মুসলমান আহলে হাদীস ছিলেন।

আরও বলা হয়, আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী সমুদয় সীমান্তবাসী আহলে হাদীস ছিলেন।' ১/৩১৭ পৃঃ।

আসহাবে সিত্তাহ বিশেষত ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসীনের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টায় সালাফী আন্দোলন বেগবান ও পূর্ণতা পেয়েছিল। অতঃপর ইমাম ইবনু

তাইমিয়া সেই আন্দোলনে সাহসী পদক্ষেপ রাখেন। তার যুগপৎ প্রচেষ্টা, কঠোর কর্মসাধনা, বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর সালাফী আন্দোলনের ভিত্ মযবুত করে। তার বহু যুগ পর আধুনিককালে শাইখ আল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের দাওয়াতী তৎপরতায় সালাফী আকীদার ও তাওহীদের আন্দোলন আরও বেগবান হয়, শিরক বিদআতের আস্তানায় এমন আঘাত লাগে যে অতি অল্পদিনেই এটি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের প্রভাবে বর্তমান সৌদি আরবের সীমানার বাইরেও আকীদা সংশোধনের লক্ষ্যে দেশে দেশে সালাফী সংগঠনের মারকায প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে।

নিঃসন্দেহে এই আন্দোলন একটি সাহসিকতামূলক সালাফী আন্দোলন। পৃথিবীর দেশে দেশে এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একটু সবিস্তারে বলতেই হয় যে, এই আন্দোলনের অভীষ্ট লক্ষ্য হল ইসলামের আদি আসল রূপের দিকে ফিরে আসা। আর এ লক্ষ্যে তখনই পৌঁছা সম্ভব যখন মুসলিমদের মূল উৎস কুরআন সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণ করা হবে। কুরআন সুন্নাহই হল আল হাক্কুল মুবীন। এ থেকে এক বিন্দু সরে যাওয়া বৈধ নয়। এই আন্দোলনের অন্যতম মূল লক্ষ্য হল তাওহীদের মর্মার্থ অনুধাবন, অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন। আর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে শিরক ও বিদআতকে উৎখাত ও নির্মূল করা। আলো ছাড়া যেমন অন্ধকার দূরীভুত হয় না, শিরকের উপস্থিতিতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাও বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীগণ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করেন যে, বিদআত ও কুসংস্কার সমূহের মুলোৎপাটন এবং সব ধরনের শিরকের নির্মূল, বান্দা ও আল্লাহর মাঝে মিথ্যা ওসিলার ধারণা দূরীকরণ এবং সূফী মতবাদের অসারতা তুলে ধরে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হতে হবে। কবর বা মাযার স্থাপন, কবরে চাঁদর আবৃতকরা সহ যাবতীয় শিরক দূর করার মাধ্যমেই প্রকৃত তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উম্মাহকে সচেতন করতে হবে যে, ইসলামের প্রকৃত সভ্যতা গড়ে উঠে পশ্চাদপদতা ও অন্যের অন্ধ অনুকরণ এর জঞ্জাল সরিয়ে দিয়েই। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার এই সালাফী দা'ওয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল: আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হবে নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা। সালাফী আন্দোলন ছাড়া সমাজে যত প্রকার আন্দোলন আছে কোথাও তাওহীদের উপর এত গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর জীবদ্দশায় ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। যদিও তা ছিল সীমিত আকারে। হিন্দুস্তানে মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন বা শিরক বিদআতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীগণ আহলুল হাদীস হিসেবে পরিচিত। এ আন্দোলন চূড়ান্তরূপ পায় হিজরী পঞ্চম শতক থেকে দশম শতকের মধ্যে। বিশেষতঃ (৪২১ হিঃ সনে ওফাত প্রাপ্ত) সুলতান মাহমূদ গজনভীর আমলে। অতঃপর ইংরেজদের বিরুদ্ধে শাহ ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জিহাদী আন্দোলন দ্বীন সংস্কারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এবং তাওহীদের মর্মার্থ তুলে ধরে সমাজ সংস্কার শুরু করে। শিরক ও মূর্তিপূজার কুফল তুলে ধরে সমাজ থেকে সব ধরনের বিদআতী কর্মকাণ্ড সংস্কারে একটি সফল আন্দোলন শুরু হয়। কুসংস্কার এবং দলপ্রীতি, গোষ্ঠীপ্রীতি ও মাযহাবের অন্ধ অনুকরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ আন্দোলন দানা বাধে।

ফলে ভারতবর্ষে আহলুল হাদীসের প্রভাবে ইলমে হাদীসের প্রচার ও প্রসার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। প্রতিষ্ঠা হয় শত সহস্র দীনী প্রতিষ্ঠান মাসজিদ ও মাদরাসা। শত সহস্র গ্রন্থ রচিত হয়। এ উদ্দেশ্যে পত্র পত্রিকা ও গবেষণাধর্মী সংকলন ছাপা শুরু হয় যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

মিসর ও সুদানে আহলুস সুন্নাহ নামে সালাফী আন্দোলন চালু আছে। মিসরে হিযবুন নূর সালাফীদের নেতৃস্থানীয় সংগঠন। নেতৃত্বের কোন্দলে মিসর ও সুদান উভয় দেশেই সালাফী

সাংগঠনসমূহ দুর্বল। এ ছাড়া উভয় দেশেই সরকারের সহযোগিতা বঞ্চিত সালাফীরা ভীষণ চাপে রয়েছেন। সুদানের রাজধানী খার্তুমে গত বছর এপ্রিলে মাসজিদের ইমাম ও খতীবের কাছে নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে, খুতবায় যেন রাজনৈতিক বক্তব্য বর্জন করা হয়। দীন থেকে দুনিয়াকে আলাদা করার পশ্চিমা নীতি ইসলামের দুশমনদের শ্লোগান। পরিতাপের বিষয়, মুসলিম দেশসমূহের সরকারপ্রধানরা মুসলমানদেরকে ঐ শিক্ষা দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে যা কখনও কাম্য হতে পারে না। আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার হল পবিত্র কুরআনের অন্যতম শিক্ষা। রাসূল সাঃ এর আদর্শে সমাজ গড়ার মূলনীতিই হল কুরআন সুন্নাহর মূলকথা। কুরআন কারীমের একাংশ গ্রহণ আরেক অংশ বর্জনে কোন সফলতা নেই। তাই বিশ্বের ইসলামি সংগঠনসমূহ বিশেষতঃ সালাফীরা প্রতিকূল পরিবেশে লক্ষ্য অর্জনে আশানুরূপ সফলতা পাচ্ছে না। মিসর সুদান ও তুরস্কে সালাফী আন্দোলনে বড় বাধা হল সুফীদের বিরোধিতা। এছাড়াও বাতেনপন্থী ও ধর্মহীনদের পক্ষ থেকে প্রবল বাধা অতিক্রম করে কৌশলে সালাফী আন্দোলন ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে। তুরস্কে শত শত বছরের উসমানী সালতানাত আমলে সেখানের শতভাগ মানুষ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল। বিগত দু'দশক আগে ইস্তাম্বুলে একটি সালাফী মানহাজের মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সালাফী দাওয়াতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দু'একজন স্থানীয় মাদানী শিক্ষক ও কুর্দি মুহাজিরদের প্রচেষ্টায় দু'দশকে হাজার খানেক মানুষ সালাফী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছে। ফা লিল্লাহিল হামদ। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ মানুষ শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী। তাদের প্রায় বেশিরভাগ আলেম আল আযহার থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত। কিন্তু পূর্ব এশিয়ার এই দেশ দু'টিতে সালাফী আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি কয়েক বছর পূর্বে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক সালাফী সম্মেলন সফল হতে দেয়া হয় নি।

পরিশেষে বলতে চাই, পৃথিবীর যেখানেই উম্মাতে মুসলিমা অবস্থান করছে সর্বত্রই সালাফী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে একটা ক্ষুদ্র দল কর্মরত রয়েছে। সবদেশের কর্মপদ্ধতি-কর্মসূচি ভিন্ন হলেও লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক। আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কর্মমুখী তৎপরতা চলছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল দেশে দেশে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা সালাফী সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। দাম্মামের সালাফী নেতা রমজান আল হাজেরীর মত একজন সালাফী শাইখের সহযোগিতা নিয়ে আমরা অচিরেই বিশ্বের সকল অঞ্চলের সালাফী সংগঠন ও ব্যক্তিদের একটা তালিকা করতঃ ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত এবং ইউরোপ আমেরিকার অগণিত ইসলামি কমপ্লেক্সগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হব বলে আমি আশাবাদী।

আজকের শুব্বানরাই আগামী দিনের সালাফী আন্দোলনের কর্ণধার। সফলতার জন্য তাদের অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। স্বভাব-চরিত্র, আদব-আখলাকের অধিকারী শুব্বান ভাইদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।

হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির।

দ্বীন প্রচারে নবী-রাসূলদের সংগ্রামী জীবন

এ, এস, এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর

আল্লাহর জন্য প্রশংসাসমূহ, দরুদ, সালাত ও সালাম মহানবী (সঃ) এর উপর বর্ষিত হোক অজুত ধারায়। বহুদিন পরে শুব্বানের এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। বিগত দীর্ঘ ৪০টি বছর এ পথ চলায় আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত । জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় অতীতের দিকে ফিরে দেখছি তো মনে হচ্ছে, মরহুম আব্বা মাওলানা মতিউর রহমান সালাফী ছাহেবের সেই কথা যা তিনি প্রায়ই বলতেন কোন কবির শেষ জীবনে নেই আক্ষেপ। "চলে যাচ্ছি আমার অনেক ক্ষত বুকে নিয়ে, আমি এক নির্বাপিত প্রদীপ, মাহফিলে রাখার যোগ্য নহি আর।" আমার প্রাণ প্রিয় সংগঠন শুব্বানে আহলে হাদীস, এর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে, যদি আরও পিছিয়ে যাই তাহলে সে সম্পর্ক আরও পুরাতন, আমি সে দিকে যেতে চাচ্ছি না। এখন ভাবছি দীর্ঘ ৫৫ বছরের সেই লক্ষ্যে পথচলা। যখন অনেক লিখেছি এখন লিখতে বসলে হাত অবশ হয়ে আসে চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তারপর আমার স্নেহধন্য শুব্বান সভাপতির অনুরোধ আমি উপক্ষো করতে পারিনি। তিনি জানালেন, আমাকে আপনাদের সামনে, "দ্বীন প্রচারে নবী, রসুলদের (সঃ) সংগ্রামী জীবন তথা ত্যাগ ও কোরবানীর উপর একটা লেখা পেশ করতে হবে। অস্বীকার করেও পার পাইনি। সেইসাথে মনে হয়েছে "হয়তো আমার এ পথে আর হবে না কো আসা" হয়তো এটাই শেষ বৈঠক হতে পারে তাই শত অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্ত্বেও এসে হাজির।

আমার স্নেহের শুব্বান কর্মীরাঃ

আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনের ত্যাগ ও কোরবানীর ইতিহাস এক দীর্ঘ বিষয় যা থেকে কিছু কিছু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রায়স পাবো আর আমার পরামর্শ থাকবে প্রত্যেক কর্মীকে আল কোরআনের পঠন ও পাঠনের মধ্য দিয়ে সেই ত্যাগ ও কোরবানীর শিক্ষাকে উপলব্ধি করে বাস্তব জীবনে তা প্রতিফলিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। তাহলে আসুন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে নবী (আঃ) দের আগমনের শুরু থেকে আরাম্ভ করি। আমাদের প্রথমে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ নবী ও রসুলদের কেন এই দুনিয়ায় পাঠিয়ে ছিলেন? এ প্রশ্নে আল্লাহ আল কোরআনের সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে বলেছেনঃ "আমরা আমাদের রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদের্শনা ও সঠিক পথের নির্দেশিকাসহ প্রেরণ করেছি আর সাথে অবতীর্ণ করেছি আল কিতাব এবং পক্ষপাতহীন সুন্দর জীবনব্যবস্থা যাতে করে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে বিরাট শক্তি আর মানুষের জন্য নানা প্রকার কল্যাণ ও উপকারিতা। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ বাস্তবে জেনে নিতে চান, না দেখেও কারা তাঁকে আর তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর ও মহা পরাক্রমশালী।"

আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবন কথা রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যঃ

মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল নিযুক্ত করেছেন। নবীরা মানুষ ছিলেন। তবে তাঁদেরকে নবী নিযুক্ত করে তাঁদের কাছে আল্লাহ নিজের বাণী পাঠিয়েছেন। তাদের তিনি সব কিছু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং তাঁরা একদিকে

ছিলেন সত্য ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। অন্যদিকে ছিলেন উন্নত চরিত্র ও নিষ্পাপ জীবনের অধিকারী। ছিলেন আদর্শ মানুষ। তাঁরা অহির মাধ্যমে আল্লাহর বাণী লাভ করতেন। তাঁরা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করতেন না।

আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব করার জন্যে। তাঁর হুকুম পালন করার জন্যে। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্যে। সেইসাথে পৃথিবীটাকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্যে। এই হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানিয়ে দিতে এবং কথাটা বারবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে। মহান আল্লাহ যাঁদের নবী নিযুক্ত করেছেন, তাঁরা সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলেছেন। নফসের তাড়না এবং শয়তানের পথ পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। নবীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁর সন্তুষ্টির পথে জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যুর পর যে চিরন্তন জীবন আছে, সেখানে তারা মহাসুখের জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবে না। মৃত্যুর পরের জীবনে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি আর শাস্তি।

নবী শব্দের অর্থ 'সংবাদ বাহক'। রসূল শব্দের অর্থ 'বাণী বাহক'। নবী রসূলগণ আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলেই তাঁদের নবী এবং রসূল বলা হয়। সকল রসূলই নবী ছিলেন। তবে সকল নবী রসূল ছিলেন না। অনেক নবীর কাছে আল্লাহ তা'য়ালা শুধু অহি পাঠিয়েছেন। আবার অনেক নবীর কাছে অহি এবং কিতাবও পাঠিয়েছেন। যাঁরা সাধারণভাবে অহি লাভ করা ছাড়া কিতাবও লাভ করেছেন, 'তাঁরাই ছিলেন রসূল।

প্রথম নবী ছিলেন মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালাম। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোনো নবী আল্লাহ নিযুক্ত করবেন না। নবীগণ মানুষকে কল্যাণের পথে ডেকেছেন। কিন্তু মানুষ সবসময় দুনিয়ার অন্ধ মোহে লিপ্ত হয়ে নবীদের বিরোধিতা করেছে। তাঁদের অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়েছে। অত্যাচার নির্যাতন করেছে। অনেক নবীকে লোকেরা নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আল্লাহর এই মহান নবীগণকে মানুষ হত্যা করার কূটকৌশল করেছে। অগণিত নবীকে তারা হত্যা করেছে। কাউকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছে। কাউকে হত্যা করার জন্যে তারা তাড়া করেছে। কাউকেও হত্যা করার জন্যে বাড়ি ঘেরাও করেছে। এখন আমাদের কাছে একথা স্পষ্ট হলো যে, পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ দুটি। একটি হলো নবীদের দেখানো পথ। এটিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ। এ পথের প্রতিদান হলো জান্নাত বা বেহেশত। অপরটি হলো আল্লাদ্রোহীতার পথ। এটি আল্লাহকে অমান্য করার পথ। আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ। নবীদের অমান্য করার পথ। শয়তানের পথ। আত্মার দাসত্বের পথ। এ পথের পরিণাম হলো জাহান্নাম, চির শাস্তি, চির লাঞ্ছনা, চির অকল্যাণ আর ধ্বংস। আমাদেরকে চলতে হবে আল্লাহর পথে। চলতে হবে নবীদের পথে। নবীদের দেখানো পথই আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ। নবীদের পথই দুনিয়ার কল্যাণের পথ। নবীদের পথই জান্নাতের পথ। নবীদের পথ শান্তির পথ। নবীদের দেখানো পথ সুন্দর পৃথিবী গড়ার পথ। নবীদের দেখানো পথ আদর্শ মানুষ হবার পথ। নবীদের পথ উন্নতির পথ, শ্রেষ্ঠত্বের পথ। তাই

আসুন আমরা নবীদের জীবনী পড়ি। তাঁদের আদর্শকে জানি। তাঁদের ভালোবাসি। তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করি এবং তাঁদের দেখানো পথে চলি।

হযরত নূহ (আঃ) :

আমরা সর্বপ্রথমে সংগ্রামী নবী হযরত নূহ (আঃ) থেকে সংক্ষিপ্তভাবে নবীদের সংগ্রামী জীবনের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। আল্লাহ নূহকে নবী মনোনীত করেন। তাঁর কাছে অহি পাঠান: "কঠিন শাস্তি আসার আগেই তুমি তোমার জাতির লোকদের সতর্ক করে দাও।"

আল্লাহ নূহের কাছে তাঁর দীন নাযিল করেন। দীন মানে জীবন যাপনের ব্যবস্থা। আল্লাহর দীনের নাম 'ইসলাম'। আল্লাহর দীন অনুযায়ী জীবন যাপন না করলে যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, নিজ জাতিকে সে ব্যাপারে সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ নূহকে নির্দেশ দেন।

নূহ তাঁর জাতির লোকদের বললেন- ' হে আমার জাতির ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তাঁর হুকুম মেনে চলো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কেবল তাঁকেই ভয় করো। আর আমার কথা মেনে চলো। আমার আনুগত্য করো। যদি তা না করো, আমার ভয় হচ্ছে, তবে তোমাদের উপর একদিন কঠিন শাস্তি এসে পড়বে। আমি কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি।' নূহ তাদের আরো বললেন- 'আমি তোমাদের যেভাবে চলতে বলছি, তোমরা যদি সেভাবে চলো, তবে আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন। নইলে কিন্তু আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে।' (সূরা নূহ- আয়াত ২৪-২৫)

নূহ (আঃ)-এর এই কল্যাণময় হিতাকাঙ্ক্ষী আহ্বানের জবাবে তাঁর জাতির নেতারা বললো, তুমি কেমন করে আল্লাহর রসূল হলে? তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ।

সাধারণ মানুষের উপর কিন্তু নূহ (আঃ)-এর ছিলো দারুন প্রভাব। তারা জাতির স্বার্থপর নেতাদের চাইতে নূহ (আঃ) কেই বেশি ভালোবাসতো। নেতারা যখন দেখলো জনগণ তো নূহ (আঃ) এর কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। তার সাথী হয়ে যাচ্ছে। তাদের সমস্ত কায়েমি স্বার্থ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তখন তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা জনগণকে বলে-' দেখো নূহ-(আঃ) এর কান্ড! সে তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। কিন্তু সে নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবি করছে। আসলে ওসব কিছু নয়। সে এভাবে দেশের প্রধান নেতা এবং কর্তা হতে চায়। কোনো মানুষ যে আল্লাহর রসূল হতে পারে, এমন কথা তো আমরা আমাদের বাপদাদার কালেও শুনিনি। আল্লাহ যদি আমাদের কাছে কোনো রসূল পাঠাতেনই তবে নিশ্চয়ই কোনো ফেরেশতা পাঠাতেন। তোমরা ওর কথায় কান দিও না। ওকে আসলে জিনে পেয়েছে।'

এভাবে বৈষয়িক স্বার্থের ধারক এই নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে দিলো। তারা নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো। নূহ (আঃ) দিন রাত তাদের সত্য পথে আনবার জন্যে যে কী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তা আমরা নূহ (আঃ)-এর কথা থেকেই জানতে পারি। তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর কাজের রিপোর্ট দিতে গিয়ে বলেন- 'হে আমার প্রভু, আমি আমার জাতির লোকদের দিনরাত ডেকেছি তোমার দিকে। কিন্তু আমার আহবানে তাদের এড়িয়ে চলার মাত্রা বেড়েই চলেছে। আমি যখনই তাদের ডেকেছি তোমার ক্ষমার দিকে, তারা তাদের কানে আঙ্গুল ঠেসে দিয়েছে। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে। এসব অসদাচরণে তারা অনেক বাড়াবাড়ি করে চলেছে। তারা

সীমাহীন অহংকারে ডুবে পড়েছে। পরে আমি তাদের উঁচু গলায় ডেকেছি। প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি। গোপনে গোপনেও বুঝিয়েছি। আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে ক্ষমা চাও। তিনি বড় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করবেন। ধন মাল আর সন্তান দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের জন্যে বাগ বাগিচা সৃষ্টি করে দেবেন। নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন।' (সূরা নূহ, আয়াত ৫-১২)

নূহ (আঃ) তাদের আবারো বুঝালেন-'হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমি মোটেও বিপথে চলছিনে। আমি তো বিশ্ব জগতের মালিকের বাণীবাহক। আমি তো কেবল আমার প্রভুর বাণীই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। আমি তো কেবল তোমাদের কল্যাণই চাই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব জিনিস জানি, যা তোমরা জানো না। হে আমার দেশবাসী! তোমরা একটু ভেবে দেখো, আমি যদি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি আর তিনি যদি আমাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহও দান করে থাকেন, কিন্তু তোমরা যদি তা না দেখতে পাও, তবে আমার কি করবার আছে? তোমরা মেনে নিতে না চাইলে আমি তো আর তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। হে আমার ভাইয়েরা! আমি যে দিনরাত তোমাদের আল্লাহর পথে ডাকছি, আর বিনিময়ে তো আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। আমি তো কেবল আল্লাহর কাছে এর বিনিময় চাই। এতে কী তোমরা বুঝতে পারছ না যে, তোমাদের ডাকার এ কাজে আমার কোনো স্বার্থ নেই?'

এভাবে আল্লাহর মহা ধৈর্যশীল নবী নূহ (আঃ) পঞ্চাশ কম হাজার বছর ধরে তাদের আল্লাহর পথে ডাকেন। তাদের সত্য পথে আনার অবিরাম চেষ্টা করেন। ধ্বংস ও শাস্তির হাত থেকে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর এই মহৎ কাজের জবাব দেয় তিরষ্কার, বিরোধিতা আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। তাদের সমস্ত বিরোধিতা আর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় হাজার বছর ধরে তিনি পরম ধৈর্যের সাথে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যান। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেন।

এবার মহান আল্লাহ অহির মাধ্যমে তাঁর প্রিয় দাস নূহ (আঃ)কে জানিয়ে দিলেন, 'হে নূহ! তোমার জাতির যে ক'জন লোক ঈমান এনেছে, তাদের পর এখন আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তুমি তাদের কার্যকলাপে দুঃখিত হয়োনা।' (সূরা হুদ, আয়াত-৩৬)

হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির বাস্তব অবস্থাও ছিল তাই। আল্লাহর নবী নূহ (আ:) হাজার বছর ধরে তাদের আল্লাহর পথে আনার চেষ্টা করেন। দিন রাত তিনি তাদের বুঝান। গোপনে গোপনে বুঝান। জনসভা, আলোচনা সভা করে বুঝান। তারা শুনতে চায় না, তবু তিনি জোর গলায় তাদের ডেকে ডেকে বুঝান। তাঁকে দেখলে তারা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতো। তিনি কথা বলতে গেলে তারা কানো আঙ্গুল চেপে ধরতো। হাজারো রকম তিরস্কার তারা তাঁকে নিয়ে করতো। বলতো এ তো ম্যাজেসিয়ান। এভাবেই হযরত নূহ (আঃ) এর দীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছরের সংগ্রামী জীবন অবাধ্য জাতিকে ডুবিয়ে মারার মধ্য দিয়ে শেষ হলো।

অগ্নি পরীক্ষায় বিজয়ী বীর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সংগ্রামী জীবন

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) যখন দুনিয়ায় আগমন করলেন তখন তাঁর কওমের লোকেরা নিজেদের হাতে মূর্তি বানিয়ে সেগুলোকে খোদা বলে মানত। যারা কারো উপকারও করতে পারে না, অপরকারও করতে পারে না, তারা খোদা হয় কেমন করে? কেউ যদি ঐ দেবতাগুলোর ক্ষতি

করতে চায়, তা থেকেও দেবতাগুলো আত্মরক্ষা করতে পারে না। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর পিতা এবং সমাজের লোকেরা বিরাট ভুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি তার বাবাকে বললেন- 'বাবা! আপনি কি মূর্তিকে খোদা মানেন? আমি তো দেখছি, আপনি আর আপনার জাতির লোকেরা পরিষ্কার ভুলের মধ্যে আছেন।' (সূরা ৬ আল আনয়াম-আয়াত ৭৪)

ইব্রাহিম (আঃ) দেখলেন, তার জাতির লোকেরা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রেরও পূজা করছে। তারা মনে করলো এগুলো তো শক্তিশালী দেবতা। কিন্তু এরা যে খোদা হতে পারেনা তিনি যুক্তি দিয়ে তা বুঝিয়ে দিলেন। রাত্রিবেলা নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ইব্রাহিম (আঃ) বললেন, তোমরা বলছো এ আমার প্রভু! অত:পর নক্ষত্র যখন ডুবে গেলো, তিনি বলে দিলেন, অস্তমিত হওয়া জিনিসকে আমি পছন্দ করি না।

এরপর উজ্জ্বল চাঁদ উদয় হলো। তিনি বললেন, তবে এই হবে প্রভু! কিন্তু যখন চাঁদও ডুবে গেলো, তখন তিনি বললেন, এতো খোদা হতে পারে না। আসল প্রভু মহাবিশ্বের মালিক নিজেই যদি আমাকে পথ না দেখান, তবে তো আমি বিপথগামীদের দলভুক্ত হয়ে পড়বো।

অতঃপর সকাল হলে পূর্বাকাশে ঝলমল করে সূর্য উঠলো। তবে তো এই হবে খোদা! কারণ এতো সবার বড়। তারপর সন্ধ্যায় যখন সূর্য ডুবে গেলো, তখন তিনি তাঁর কওমকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা যাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তার অংশীদার ভাবছো, আমি তাদের সকলের দিক থেকে মুখ ফিরালাম। আমি সেই মহান প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করছি, যিনি আসমান আর জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার বানাবো না। শুরু হলো বিবাদ এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর জাতির লোকেরা তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হলো। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা কি মহান আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছো? অথচ তিনি তো সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর অংশীদার মানো, আমি ওদের ভয় করি না। আমি জানি, ওরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর বাবাকে বললেন, 'বাবা, আপনি কেন সেইসব জিনিসের ইবাদত করেন। যেগুলো কানে শুনেনা, চোখে দেখেনা এবং আপনার কোনো উপকার করতে পারে না? বাবা! আমি সত্য জ্ঞান লাভ করেছি, যা আপনি লাভ করেননি। আমার দেখানো পথে চলুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো। বাবা! কেন আপনি শয়তানের দাসত্ব করছেন। শয়তান তো দয়াময় আল্লাহর অবাধ্য।' (সুরা ১৯ মরিয়ম, আয়াত ৪২-৪৪)

জবাবে ইব্রাহিম (আঃ)-এর পিতা বললেন, 'ইব্রাহিম! তুই কি আমার খোদাদের থেকে দূরে সরে গেলি? শোন্ এই পথ থেকে বিরত না হলে আমি তোকে পাথর মেরে হত্যা করবো। (সূরা মরিয়াম: আয়াত ৪)

রাজদরবারে আনা হলো: তারা ইব্রাহিম (আঃ) কে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়লো। কী করবে তাকে নিয়ে! সে তো দেবতাদের আর কোনো মান ইজ্জতই বাকি রাখলো না। তারা বিভিন্ন রকম সলাপরামর্শ করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিমের বিষয়টি তারা রাজার কানে তুললো। তাদের রাজা ছিলো নমরূদ। নমরূদকে তারা বুঝালো, ইব্রাহিম (আঃ) নিতে না পারলে সে আমাদের ধর্মও বিনাশ করবে, আপনার রাজত্বও বিনাশ করবে। রাজা বললেন, ইব্রাহিম (আঃ কে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর ইব্রাহিম (আঃ)কে নমরুদের সামনে হাযির করা হলো। নমরূদ

তাঁর সাথে কথা বললো। ইব্রাহিম (আঃ) তাকে আল্লাহর দিকে আহবান জানান। কিন্তু নমরুদ ইব্রাহিম (আ) এর সাথে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক শুরু করলো। বললো: তোমার প্রভু কে?

ইব্রাহিম (আঃ): আমার প্রভু তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন।

নমরুদঃ আমিও মানুষকে মারতে পারি, আবার জীবিত রাখতে পারি। (নমরুদ মৃত্যুদন্ড দেয়া দু'জন কয়েদী এনে একজনকে হত্যা করলো, আরেকজনকে ছেড়ে দিলো।)

ইব্রাহিম (আঃ): 'আমার আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উঠান, তুমি যদি সতি সত্যি প্রভু হয়ে থাকো, তবে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও দেখি। (সূরা আল বাকারা আয়াতঃ ২৫৮)

একথা শুনে রাজা হতভম্ব, হতবাক ও নিরুত্তর হয়ে গেলো। আল্লাহ তো জালিমদের পথ দেখান না। এভাবে ইব্রাহিমের যুক্তির কাছে রাজা-প্রজা সবাই পরাস্ত হলো। ইব্রাহিম যুক্তির মাধ্যমে মূর্তিকে খোদা মানার অসারতা প্রমাণ করে দিলেন। চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রকে খোদা মানা ভুল প্রমাণ করে দিলেন। রাজা বাদশাহকে প্রভু মানার ভ্রান্তি-স্পষ্ট করে দিলেন। তাদের ধর্ম এবং সব দেবতাই যে মিথ্যা, সেকথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার করে দিলেন। সাথে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান। আল্লাহর পয়গাম তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দেন।

অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপঃ

কিন্তু তারা কিছুতেই ঈমান আনল না, বরং নৈতিকভাবে ইব্রাহিম (আঃ)-এর কাছে পরাজিত হয়ে তারা তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। অন্ধ বর্বরতায় মেতে উঠলো তারা। সিদ্ধান্ত নিলো ইব্রাহিমকে হত্যা করার। কিন্তু কীভাবে হত্যা করবে তাঁকে? তারা ফায়সালা করলো বিরাট অগ্নিকুন্ড বানাবে। তারপর তাতে পুড়িয়ে মারবে ইব্রাহিমকে (আঃ)।

যে কথা সে কাজ। এক বিরাট অগ্নিকুন্ডলি বানালো তারা। এটা ছিলো ইব্রাহিম (আঃ) এর জন্য এক বড় পরীক্ষা। আল্লাহও ইব্রাহিম (আঃ) কে বাজিয়ে নিতে চাইলেন। তিনি দেখতে চাইলেন ইব্রাহিম কী জীবন বাঁচাবার জন্যে ঈমান ত্যাগ করে, নাকি ঈমান বাঁচাবার জন্যে জীবন কুরবানী করে? কিন্তু ইব্রাহিম তো অগ্নি পরীক্ষায় বিজয়ী বীর। তিনি তো কিছুতেই জীবন বাঁচাবার জন্যে আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীনকে নিজের জীবনের চাইতে অনেক অনেক বেশি ভালবাসেন।

কাফিররা তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার জন্যে নিয়ে গেলো। তিনি তাদের কাছে নত হননি। জীবন ভিক্ষা চাননি। জীবন বাঁচাবার জন্যে নিজের দীন এবং ঈমান ত্যাগ করেননি। তাঁর তেজদীপ্ত ঈমান তাঁকে বলে দিলোঃ ইব্রাহিম! জীবন মৃত্যুর মালিক তো তোমার মহান প্রভু আল্লাহ! তাঁর ঈমান তাঁকে বলে দেয়, আল্লাহ যদি আমার ক্ষতি করতে না চান, তবে গোটা পৃথিবী এক হয়েও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তবে গোটা পৃথিবী এক হয়েও তা থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

নিশ্চিত মনে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি অগ্নিকুন্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওরা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষেপ করলো নিজেদের তৈরি করা নরকে। আল্লাহ ইব্রাহিমের প্রতি পরম খুশি হয়ে আগুনকে বলে দিলেনঃ 'হে আগুন! ইব্রাহিমের প্রতি সুশীতল এবং শান্তিময় হয়ে যাও'। আগুনের কি সাধ্য আছে সৃষ্টিকর্তার হুকুম অমান্য করার?

সুতরাং অগ্নিকুন্ডে ইব্রাহিম সম্পূর্ণ নিরাপদ থেকে গেলেন। আগুন তাঁর কোনোই ক্ষতি করলো না। বরং আল্লাহর হুকুমে সে ইব্রাহিমের সেবায় নিয়োজিত হলো। ইব্রাহিমের জাতি আবার তাঁর

কাছে পরাজিত হলো। ইব্রাহিম আবার তাদের কাছে প্রমাণ করে দিলেন, তাদের দেবতারা নিজেদের রক্ষা করতেই অক্ষম। আর তিনি যে মহান প্রভুর প্রতি তাদের ডাকছেন, তিনি যে কোনো ক্ষতি থেকে বান্দাদের রক্ষা করতে সক্ষম। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যার হুকুম পালন করা উচিত। যার ইবাদত উপাসনা করা উচিত।

কুরআনে হযরত ইব্রাহিমের প্রশংসনীয় গুণাবলী:

হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাঁর প্রশংসায় মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এখানে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করলাম-

১. পৃথিবীর কাজের জন্যে আমি ইব্রাহিম (আঃ) কে বাছাই করেছিলাম।
২. তার প্রভু যখন বললেন : 'আত্মসমর্পণ করো'। তিনি বললেন সারা জাহানের প্রভুর নিকট আমি আত্মসমর্পণ করলাম।'
৩. 'তিনি বললেন, পুত্র আমার! মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত থাকো।'
৪. 'তোমরা খাঁটিভাবে ইব্রাহিমের পথ অনুসরণ করো।'
৫. 'আল্লাহ ইব্রাহিমকে তাঁর বন্ধু বানিয়েছেন।'
৬. 'আমি ইব্রাহিমকে আসমান ও জমিনের সমস্ত নিদর্শন দেখিয়াছি।
৭. সে বললো, আমি আসমান ও জমিনের স্রস্টার দিকে মুখ ফিরালাম।
৯. ইব্রাহিম নিজেই ছিলো একটি উম্মাহ। সে একমুখী হয়ে আল্লাহর অনুগত ছিলেন।
১০. আল্লাহর অনুগ্রহরাজির প্রতি তিনি ছিলেন শোকর গুজার। তিনি তাকে পছন্দ করেছেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।
১১. ইব্রাহিম ছিলেন এক অতি সত্যবাদী মানুষ এবং নবী।
১২. ইব্রাহিমকে আমি সতর্কবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছি।
১৩. আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের প্রতি সুশীতল, শান্তিময় ও নিরাপদ হয়ে যাও।'
১৪. আমি ডেকে বললাম, হে ইব্রাহিম! তুমি স্বপ্নে দেখা হুকুমকে সত্যে পরিণত করেছো।
১৫. তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্রাহিমের মধ্যে...।

মূসা কালিমুল্লাহ

এখন যাঁর সম্পর্কে আলোচনা করবো, তিনি আর কেউ নন হযরত মূসা কালিমুলাহ (আঃ) তাঁর সংগ্রামী জীবনের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো-

এক অপরূপ শিশু! কে এই শিশু? আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন, এই শিশুটি কে? হ্যাঁ, এই শিশুই মুসা (আঃ)। পৃথিবীর ইতিহাসে এক কালজয়ী মহাপুরুষ হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নাম উচ্চারিত হবে। তিনি হযরত ইব্রাহিমের নাতি হযরত ইয়াকুবের বংশধর। হযরত ইয়াকুবের পুত্র হযরত ইউসূফ। তাঁদের সকলের উপর শান্তিবর্ষিত হউক।

নদীতে হযরত মূসা (আঃ)

নদীতে মূসা (আঃ): এ সময় দয়াময় আল্লাহ মূসার মায়ের প্রতি রহম করেন। তিনি তার প্রতি অহি নাযিল করলেন: 'তখন আমি মূসার মা'র কাছে অহি করলাম, ওকে দুধ পান করাতে থাকো। যদি ওকে মেরে ফেলবে বলে আশংকা করো, তবে ওকে একটি সিন্দুকে ঢুকিয়ে সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দাও। এতে তুমি ভয় পেয়োনা আর চিন্তিতও হয়ো না। আমি ওকে আবার তোমার কোলে ফিরিয়ে দেবো। তাছাড়া আমি রাসূল বানাবো। (সুতরাং তুমি ওকে

সিন্দুকে করে নদীতে ছেড়ে দাও) নদী ওকে তীরের দিকে ঠেলে দিবে। তখন এমন এক লোক তাকে নিয়ে নেবে, যে আমারও শত্রু, ওরও শত্রু। (সুরা কাসাস, আয়াত ৩৮-৩৯)

শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী হয়ে ওঠেন

মূসার বয়স ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে তারুণ্যে, তারুণ্য থেকে যৌবনে পদার্পণ করেন মূসা। নিজের পূর্ব পুরুষ হযরত ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব এবং ইউসুফের মতো উন্নত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণাবলী আল্লাহ তাঁকে দান করেন। আল্লাহ বলেন- 'মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছালো এং তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো, আমি তাকে বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, বিচার শক্তি এবং (দীনি ও জাগতিক) জ্ঞান দান করলাম। উপকারী লোকদের আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।' (সূরা আল কাসাস- আয়াত ১৪)

আমার দুটি নিবেদন শুনোঃ

আল্লাহ যখন রিসালতের মিশন নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাবার নির্দেশ দিলেন, তখন মুসার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো অতীতের সমস্ত তিক্ত ইতিহাস। তিনি আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন- হে আল্লাহ! তোমার নির্দেশ তো অবিশ্য অলঙ্গনীয়। তবে তুমি আমার দুটি কথা শুনো। আমার বিরুদ্ধে ওদের একটি মার্ডার কেস (হত্যা মামলা) আছে। আমার সে অপরাধটি যদিও তুমি আমাকে মাফ করে দিয়েছো, কিন্তু ওরাতো আমাকে মাফ করেনি। ওরা তো আমাকে হত্যা করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি তো জানো, সে কারণেই আমি এতোদিন পলাতক ছিলাম। আমার আশংকা হয় ওরা আমাকে অস্বীকার করবে এবং আমাকে হত্যা করবে। তাছাড়া তুমিতো জানো আমার মুখে জড়তা আছে। আমার বক্তব্য স্পষ্ট হয় না। হারুন আমার বড় ভাই। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, অনর্গল বক্তা। তাছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ওদের কোনো অভিযোগও নেই। সুতরাং প্রভু। তুমি হারুনকেও আমার সাথে রসূল বানিয়ে দাও, তাকে আমার উযির বানিয়ে দাও। যাতে করে আমরা দুজনে মিলে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব ঘোষণা দিতে পারি এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারি। আর তুমি আমার হৃদয় মনের দুয়ার খুলে দাও। আমার সাহস বাড়িয়ে দাও। আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও। যাতে করে আমার কথা তারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।

আল্লাহ বললেন- 'মূসা! তোমার সমস্ত নিবেদন মঞ্জুর করা হলো।' এর মানে-

১. ফেরাউনরা আল্লাহর নবী হযরত মূসার রসূল হবার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে না।
২. মূসাকে হত্যা করতে পারবে না।
৩. মূসার মুখে আর কোনো জড়তা ও তোতলামি থাকবে না।
৪. মূসা প্রভাবশালী ও আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখতে পারবেন।
৫. মূসা সবসময় সাহসী ও নির্ভিক থাকবেন।
৬. ভাই হারুনকেও রসূল নিয়োগ করা হবে।
৭. হারুন মুসার উযির হিসেবে কাজ করবেন।

ফেরাউনের দরবারে মূসাঃ

এবার ফেরাউনের সামনে উপস্থিত হবার পালা। ফেরাউনের সামনে উপস্থিত হতে হবে দাওয়াত আর দাবি নিয়ে। ক্ষমতায় এখন দুর্ধর্ষ ফেরাউন মিনফাতা। চরম স্বৈরাচার ও একনায়ক মিনফাতা। গোটা মিশর সাম্রাজ্যের একটি লোকও তার সামনে কথা বলার সাহস রাখে না। কারণ ঘাতক স্বৈরাচারের ত্রাসে সব মানুষ আতংকিত। মানুষের জীবনের কোনো মর্যাদা তার কাছে নেই।

এই স্বৈরাচারীর সামনে গিয়েই মূসাকে দাঁড়াতে হবে। তাকে বলতে হবে আল্লাহর পথে আসার কথা। তাকে বলতে হবে বনি ইসরাঈলের উপর নির্যাতন বন্ধের কথা। ফেরাউনের সামনে উপস্থিত হবার পূর্বক্ষণে অহি এলো। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হলো কীভাবে কথা বলতে হবে, সে টেকনিক

'মূসা! তুমি সময় মতোই এসে পৌঁছেছো। আমি তো আমাকে আমার কাজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছি। এখন তুমি আর তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ ফেরাউনের কাছে যাও। সেখানে বলিষ্ঠভাবে আমার কথা বলতে ত্রুটি করো না। তবে কোমল ও নম্র ভাষায় তাকে দাওয়াত দিও। তোমরা দাওয়াত দিলে সে হয়তো দাওয়াত গ্রহণ করবে, না হয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। (সূরা ত্বহা: আয়াত ৪০-৪৪)

এর পর চলতে থাকে মূসা ও হারুনের উপর নির্যাতন। নির্যাতন চালাবেন না। আপনি সঠিক পথে আসুন, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে। অহির মাধ্যমে আমাদের জানানো হয়েছে, ঐ ব্যক্তির জন্যে নির্ঘাত শাস্তি রয়েছে, যে বিশ্বজগতের প্রভুকে অস্বীকার করবে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

যাদুর খেলা হোক: ফেরাউনের মোসাহেবরা তাকে পরামর্শ দিলো, মূসাকে যাদু দিয়েই পরাজিত করতে হবে। মিশরে যেসব দক্ষ যাদুকর আছে এমন পাকা যাদুকর আর কোথাও নেই। মূসার সাথে যাদু প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ ঠিক করুন। আর এদিকে মিশরের সব দক্ষ যাদুকরদের খবর দিন। জনসমক্ষে যাদুর খেলা হবে। আমাদের দক্ষ যাদুকরদের কাছে মূসা পরাজিত হয়ে যাবে। তখন মানুষ তার প্রতি সমর্থন ত্যাগ করবে এবং আপনার প্রভূত্বকে চ্যালেঞ্জ করার আর কেউ থাকবে না।

লাঠির মুজিযা প্রদর্শন করার পূর্বক্ষণে মূসা যাদুকরদের বললেন:

'তোমার যা কিছু প্রদর্শন করবে ওগুলো তো যাদু। আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের এসব যাদু নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ কখনো সার্থক করেন না। অপরাধীদের জন্যে যতই অসহনীয় হোক না কেন, আল্লাহ তাঁর নিদর্শন দ্বারা অবশ্যি সত্যকে সত্য বলে প্রমাণ করে দেবেন। (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮১-৮২)

এ কথাগুলো বলে মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে লাঠি এক বিরাট আজদাহা অজগর হয়ে হা করে উঠলো। চোখের নিমিষে সে খেয়ে ফেললো যাদুকরদের প্রদর্শিত সব যাদু। শুধু কি তাই? যাদুকরদের যাদু দেখাবার সব ক্ষমতাও রহিত হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা তদবির করেও তারা আর কোনো যাদু দেখাতে পারলো না। সব যাদুকর কুপোকাত।

মূসা যে যাদুকর নন, তিনি যে সত্যি আল্লাহর নবী যাদুকররা এ মহাসত্য উপলব্ধি করলো। সত্য তাদের কাছে দিনের আলোর মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখে তারা তাঁর মহিমা অনুভব করলো। তারা সবাই মূসার প্রতি ঈমান আনলো।

এভাবে যাদুকরদের পরাজয়ের ফলে ফেরাউনের চরম পরাজয় হলো। মূসা যে যাদুকর নন, তিনি যে আল্লাহর নবী সে কথা বিবেক বুদ্ধিওয়ালা কোনো ব্যক্তিরই আর বুঝতে বাকি থাকলো না। এভাবেই হযরত মূসা (আঃ) এর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন চলতো থাকলো।

"আল্লাহ আমার প্রভূ শুধু একথাটি বলার কারণেই কি তোমরা একজন মহাপুরুষকে হত্যা করবে? অথচ তিনি তো তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নির্দশন নিয়ে এসেছেন। তোমরা

যে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছো, তিনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তাঁর মিথ্যার দায় দায়িত্ব তো তাঁর। কিন্তু তিনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে যেসব ভয়ংকর পরিণতির কথা তিনি বলছেন তার কিছুটা হলেও তো গ্রাস করবে তোমাদের। আল্লাহ সীমালঙ্গনকারী মিথ্যাবাদীদের সঠিক পথ দেখান না।"

হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আজ তোমরা রাজত্বের অধিকারী এবং এই ভূখন্ডের বিজয় শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে পড়লে আমাদের সাহায্য করার কে আছে?

এমনি করে হযরত মূসা (আঃ) এর সংগ্রামী জীবন চলতে থাকে।

এরপর আসলেন ইহুদীদের শেষ নবী হযরত ঈসা (আঃ)

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাইলদের মাঝে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন-

১. এক আল্লাহর একত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার আহ্বান।
২. মানুষের মনগড়া আইন নয়, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান মেনে নেয়ার ও অনুকরণ করার আহ্বান।
৩. নবীর আনুগত্য ও অনুসরণের আহ্বান।
৪. শিরক পরিত্যাগ করার আহ্বান।
৫. আল্লাহই সব মানুষের মালিক ও প্রভূ। নবী এবং সব মানুষ তাঁর দাস। সুতরাং কেবল আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়ার আহ্বান।
৬. জাহান্নাম থেকে সতর্ক হবার আহ্বান।

ইহুদী ধর্মের রাব্বি তথা পুরোহিতরাই হযরত ঈসা (আঃ)কে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা শুরু করে। তারা ধর্মকে উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল। নিজেদের সুবিধা মতো তারা আল্লাহর কিতাব তাওরাতকে রদবদল করে নিয়েছিল।

তারা অভিশপ্ত হয়েছে আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি' তাদের এই উক্তির জন্যে। অথচ আসল ঘটনা হলো, তারা ঈসাকে হত্যাও করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি, বরং তাদের সামনে গোলক ধাধা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল। আসলে এ বিষয়ে তাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই। তারা চলছে আন্দাজ অনুমান নিয়ে। একথা নির্ঘাত সত্য যে, আল্লাহ তাকে নিজের দিকে তুলে নিয়ে গেছেন। আসলে আল্লাহ মহাকৌশলী ও অপরাজিত শক্তিধর। (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৫৭-১৫৮)

এভাবে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সংগ্রামী জীবন চালিয়ে যান।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুলাহ (সাঃ)

নবুয়তের ধারা একটি মুক্তার মালার মতো। এ মালার প্রথম মুক্তার নাম আদম এবং শেষ মুক্তার নাম মুহাম্মদ। এ দুটি মুক্তার মাঝখানে রয়েছে শত শত হাজার হাজার মুক্তা।

অনন্য তিন বৈশিষ্ট্য: অন্যসব নবী রসুলের মতোই মুহাম্মদ রসূলুলাহ (সাঃ) ছিলেন একজন মানুষ, একজন নবী, একজন রসুল। তবে মহাবিশ্বের মালিক মহান আল্লাহ তাঁকে এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা অন্য কোনো নবী রসূলকে দান করেননি। সে তিন বৈশিষ্ট্য হলো:

১. সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ নবুয়ত ও রিসালাতের ধারা শেষ করে দিয়েছেন। তাঁর নবুয়্যতি আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয়।
২. বিশ্বনবী। মহান আল্লাহ তাঁকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে কিয়ামত পর্যন্ত কার সমস্ত মানুষের নবী ও রসূল নিযুক্ত করেছেন।

৩. সমগ্র মানব জাতির জন্যে রহমত ও আর্শিবাদ। তাঁকে পাঠানো হয়েছে রহমত, আর্শিবাদ ও অনুকম্পা স্বরূপ সমগ্র মানবজাতির জন্যে।

এ তিনটি বিষয়ের প্রমাণ হলো আল কুরআনের নিম্নোক্ত তিনটি আয়াত:

১. মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; রং আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত। (সুরা আহযাব: ৪০)

২. আমরা অবশ্যই তোমাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্কবাণী হিসেবে। তবে অধিকাংশ মানুষই এলেম রাখে না। (সূরা সাবা: ২৮)

৩. (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমাকে রসূল মনোনীত করে পাঠিয়েছি সমগ্র জগদ্বাসীর জন্যে রহমত। (অনুকম্পা ও আশির্বাদ) হিসেবে। (সূরা আল আম্বিয়া: ১০৭)

আল্লাহর দিকে আহ্বানের গুরু দায়িত্ব:

নবুয়্যত ও রিসালাত হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক মহান দায়িত্ব। এ হলো, মানব সমাজের কাছে মহান আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব। এ হলো মানব সমাজকে এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে আহ্বানের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব মানবতার মুক্তির দায়িত্ব।

১. বার্তাবাহক (রসুল)
২. আল্লাহর দিকে আহ্বায়ক (দা'য়ী ইলাল্লাহ)
৩. সুসংবাদাতা (বাশীর)
৪. সতর্ককারী (নাযীর)
৫. সত্যের সাক্ষী (শাহেদ)
৬. সর্বোত্তম আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানা) এবং
৭. মহাসত্যের অনাবিল আলো বিতরণকারী এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ (সিরাজাম মুনিরা)।

এ লক্ষ্যে মহান আল্লাহ বলেন-

* হে মুহাম্মদ! বলো, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর বার্তাবাহক। (আল কুরআন)

* গোটা মানব জাতির জন্যে আমরা তোমাকে বার্তাবাহক নিযুক্ত করেছি। (আল কুরআন)

* যাতে করে রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়। (আল কুরআন)

* হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে আর আলো বিতরণকারী সমুজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। (আল কুরআন)

এসব দায়িত্ব পালনে তিনি নিজেকে এতটাই নিবেদিত করেছিলেন যে, তিনি নিজের জীবনের প্রতিও অনেকটা বেপরোয়া বা বেখেয়াল হয়ে উঠেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তাঁকে এভাবে সতর্ক করেন-

'তারা এ বাণীর প্রতি ঈমান আনে না বলে সম্ভবত দুঃখে শোকে আর হতাশায় তুমি নিজেকেই বিনাশ করে ছাড়বে। (আল কুরআন)

এভাবে মহানবি (সা) মানব সমাজকে সাফল্যের দিকে আহ্বান করেন-

১. মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন, তিনিই আল্লাহ। মহাবিশ্ব, পৃথিবী, মানুষ এবং সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবার প্রভূ। তিনিই মহাজগত মহাবিশ্বের প্রতিপালক, পরিচালক ও শাসক।

২. তিনি এক ও একক। তিনি সন্তান গ্রহণ করেন না। তিনিও কারো সন্তান নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কোনো বিষয়েই তার কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। কোনো বিষয়েই তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কোনো বিষয়েই কারো কাছ থেকে তাঁর কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বোচ্চ, সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। সবাই ও সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

মক্কায় তের বছর দা'ওয়াতঃ

মক্কায় তের বছর তিনি মানুষকে দাওয়াতের দিকে আহ্বান করেন। সর্বোত্তম পন্থা আর মর্মস্পর্শী উপদেশের মাধ্যমে তিনি মানুষকে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানের উপকরণ ছিলো আল - কুরআন। এই তের বছর তাঁর কাছে কুরআন নাযিল হয়েছে ঐ বিষয়গুলোকে চমৎকার যুক্তি, উপমা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সহকারে বাস্তব ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে। তিনি তাঁর দাওয়াত ও আহ্বান হিসেবে মানুষের কাছে হুবহু উপস্থাপন করেন আল্লাহর বার্তা আল - কুরআন।

১. মানুষের জীবন লক্ষ্যের পরিবর্তন।
২. মানুষের ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।
৩. মানুষের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন।
৪. সমাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন।
৫. নেতৃত্বের পরিবর্তন।

কুরআনের আলো বিতরণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, দৃষ্টান্ত স্থাপন, এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য এবং সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে তিনি সমাজ ও সাথীদের মাঝে এসব পরিবর্তন সাধন করেন।

বন্দী জীবনঃ চরম দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটতে থাকে। চরম খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা এবং গাছের ছাল আহার করেন। তাঁরা ক্ষুধার্ত এবং রোগক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। নবুয়্যতের সপ্তম বর্ষ থেকে দশম বর্ষের সূচনা পর্যন্ত তিন বছর তাঁরা এখানে বন্দী থাকেন। অতঃপর পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে বিরোধী নেতারা রসূল (সাঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়।

তায়েফে দাওয়াতঃ মক্কার পরেই তায়েফ ছিলো অধিকতর প্রভাবশালী শহর। মক্কার লোকদের আর ঈমান আনার লক্ষণ ক্ষীণ দেখে রাসুল (সাঃ)তায়েফের সরদারদের কাছে মহাসত্যের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তায়েফ যান। তাদের দাওয়াতদেন আল্লাহর দিকে।

মক্কার নেতারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ না করায় এবং বিরোধিতা করায় তারাও তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, তারা আল্লাহর রসূলকে লাঞ্ছিত করার জন্যে তাঁর পেছনে বখাটে যুবকদের লেলিয়ে দেয়। তারা রসূল (সাঃ) কে চরমভাবে নির্যাতিত করে, লাঞ্ছিত করে। তাঁর সাথে গিয়েছিলেন তাঁর সেবক যায়েদ। অতঃপর তিনি যায়েদকে নিয়ে ফিরে আসেন মক্কায়।

হিজরতঃ সাহাবীগণের উপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই আল্লাহর নির্দেশে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন।

হত্যার ষড়যন্ত্র : 'স্মরণ করো, কাফিররা তোমাকে বন্দী করার, কিংবা হত্যা করার, অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করার ষড়যন্ত্র করছিল। তারা লিপ্ত ছিলো তাদের চক্রান্তে । এদিকে আল্লাহও তাঁর পরিকল্পনা পাকা করে রাখেন। আল্লাহই সবচেয়ে দক্ষ পরিকল্পনাকারী।' (সূরা আনফাল : আয়াত-৩০)

উহুদ যুদ্ধঃ কুরাইশরা বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পরের বছর তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে আবার মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। এবার তারা তাদের প্রভাবিত পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের সাথে নেয়। তারা তিন হাজার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় টিকতে না পেরে কুরাইশ বাহিনী তাদের সাজ সরঞ্জাম ফেলে পালাতে শুরু করলো। মুসলিম বাহিনী তাদের চরম তাড়া করে। এদিকে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী দলের প্রধান খালিদ বিন অলিদ সুড়ঙ্গ পথ অরক্ষিত পেয়ে তার বাহিনী নিয়ে এখান দিয়ে ঢুকে পড়েন। আব্দুলাহ এবং তার স্বল্পসংখ্যক সাথিরা তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করে শাহাদাত করণ করেন। এরই মধ্যে মুসলিম বাহিনীর বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। আহত হন অনেকে। কয়েকজন সৈনিক কর্তৃক সেনাপতির নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলে মুসলিম বাহিনীর উপর নেমে আসে এই বিরাট বিপর্যয়।

বিদায় হজ্বঃ হজ্ব উপলক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) দুটি প্রধান ভাষণ প্রদান করেছিলেন। একটি ৯ জিলহজ্ব তারিখে আরাফার ময়দানে। অপরটি ১০ জিলহজ্ব তারিখে মিনায়। এ দুটি ভাষণে ইসলামের অনেকগুলো মৌলিক নির্দেশনা তিনি প্রদান করেছিলেন। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখকরা হলোঃ

১. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। মুহাম্মদ তাঁর দাস ও রসূল।
২. আজ সকল প্রকার কুসংস্কার অন্ধ-বিশ্বাস এবং সকল প্রকার অনাচার আমার পদতলে দলিত-মথিত হয়ে গেল।
৩. তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। তাদের সাথে তোমরা খারাপ ব্যবহার কোরো না। তাদের ওপর নির্যাতন করবে না। তোমরা যা খাবে তাদেরকে তোমরা তাই খেতে দিবে। তোমরা যে বস্ত্র পরিধান করবে তাদেরকে তাই পরিধান করতে দিবে। মনে রেখো তারাও মানুষ তোমরাও মানুষ। এরাও একই আল্লাহর সৃষ্টি।
৪. সাবধান! নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের ওপর কখনো অন্যায়-অত্যাচার করবে না। কেননা তারা হলো অবলা। কেননা তাদের দায়িত্ব তোমাদের ওপরই। তোমাদের যেমন নারীদের ওপর অধিকার আছে। তেমনি তোমাদের ওপরও নারীদের অধিকার আছে। দয়া ও ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের সাথে আচরণ করবে।
৫. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে সে কুফুরি করল।

৬. সুদ ঘুষ রক্তপাত অন্যায় অবিচার জুলুম নির্যাতন কোরো না। কারণ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। আর মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃসমাজ।

৭. তোমরা মিথ্যা বোলো না। কারণ মিথ্যা সব পাপ কাজের মূল। কারণ মিথ্যাই বিপদ ডেকে আনে।

৮. চুরি কোরো না। ব্যভিচার কোরো না। সর্বপ্রকার মলিনতা হতে দূরে থেকো। পবিত্রভাবে জীবনযাপন করো। সাবধান! শয়তান থেকে তোমরা দূরে থেকো। তোমরা কোনো একটি কাজকে খুব সামান্য মনে করবে, কিন্তু শয়তান এসবের মাধ্যমে তোমাদের সর্বনাশ করিয়ে ছাড়বে।

৯. তোমরা তোমাদের নেতার আদেশ অমান্য করবে না। যদিও হাবশি নাক কাটা গোলাম হয়। তোমরা তার আনুগত্য করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর দীনের ওপর থাকবে।

১০. ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোরো না। কারণ তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এই কারণে ধ্বংস হয়েছে।

১১. বংশের গৌরব কোরো না। যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় প্রতিপন্ন করে অপর বংশের পরিচয় দেয় তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।

১২. তোমরা তোমাদের প্রভূর এবাদত করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে। রোজা রাখবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, তবেই তোমরা জান্নাতি হতে পারবে।

১৩. আমি আমার পরে তোমাদের জন্য যা রেখে যাচ্ছি তা তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে। তার ওপর আমল করবে। তাহলে তোমাদের পতন ঘটবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কুরআন ও নবীর সুন্নত।

১৪. আজি আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের দীনকে (জীবন ব্যবস্থা), পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত (কুরআন) এবং তোমাদের জন্যে দীন (ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা) মনোনীত করলাম ইসলামকে।' (সূরা- আরাফ- ৫)

১৫. আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোদিন এ দুটোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততোদিন তোমরা বিপথগামী হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) আর অপরটি হলো তাঁর রসূলের সুন্নাহ।

সঠিক পরিকল্পনা: কাজ সুসম্পন্নের অর্ধেক

মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

শুরু হলো নতুন বছর- ২০২০ সাল। ৩৬৫ দিন। সবার জন্যে সময়ের মাপকাঠি সমান হলেও প্রাপ্তি সবার সমান হয় না। কারণ সময়কে কাজে লাগানোর ধরনে রয়েছে মানুষে মানুষে বিস্তর ফারাক। তাই প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, নতুন বছর হলো একটি বই আর বছরের প্রতিটি দিন একেকটি সাদা পৃষ্ঠা। বছর শেষে বইটি কেমন হবে, তা নির্ভর করছে ব্যক্তির প্রতিদিনের জীবন ও কাজের ওপর। একটি বছর আমাদের তাই উপহার দেয়, যা আমরা তাকে দেই। এভাবেই জীবনের চিত্র গড়ে উঠে; যা আমরা যাপিত জীবনে করে থাকি। তাই নতুন বছরে অনেক প্রত্যাশার সাথে থাকুক একটি সুন্দর ও সহজ পরিকল্পনা। কারণ সঠিক পরিকল্পনা কাজ সুসম্পন্নের অর্ধেক। কাজের প্রস্তুতি এবং প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে যিনি যত গোছানো, তার অর্জনের পাল্লা হবে তত ভারী। জীবনে তার সফলতা ও সার্থকতার পরিধিও হবে ততো ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানব সভ্যতার দেয়ালে সার্থকতার পদচিহ্ন আঁকার পাশাপাশি মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছানো তার জন্যে অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পরিকল্পনা কী?

একজন ছাত্র তার শিক্ষা জীবনের শুরুতে মনে মনে কল্পনা করে নেয় কর্মজীবনে সে কোন পেশা গ্রহণ করবে এবং তার পছন্দসই পেশা অর্জনের জন্য তাকে কী ধরনের লেখাপাড়া, কেমন পরিশ্রম করতে হবে, খরচ কোথা থেকে আসবে, এর জন্য সে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার পড়ালেখা সমাপ্ত করবে ইত্যাদি। তাকে আগে থেকেই কল্পনা করে রাখতে হবে। এই সব কর্মপদ্ধতি কোন প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করবে তা পূর্বেই ঠিক করা হচ্ছে পরিকল্পনা। A plan is typically any diagram or list of steps with details of timing and resources, used to achieve an objective to do something. It is commonly understood as a temporal set of intended actions through which one expects to achieve a goal. তাই বলা যায়, ভবিষ্যতে একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী কাজ করতে হবে, কীভাবে, কোথায়, কখন এবং কত সময়ে এই কাজ শেষ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়াই হচ্ছে পরিকল্পনা। বিভিন্ন মনীষী পরিকল্পনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলঃ "হেনরি ফেয়ল তাঁর General and Industrial Management গ্রন্থে বলেন, "পরিকল্পনা হল ভবিষ্যত নির্ধারণ করা এবং তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।" টেরী এবং ফ্রাংকলিন- এর মতে - "পরিকল্পনা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ কী করতে হবে ধারণা তৈরী ও বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করা।" কুঞ্জ এবং উইরিচ এর মতে "লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী নির্ণয় এবং তা অর্জনের জন্য করণীয় কাজ নির্ধারণের সাথে পরিকল্পনা জড়িত। এ জন্য প্রয়োজন হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থাৎ ভবিষ্যত একাধিক বিকল্প কর্মধারা থেকে একটিকে বাছাই করা।" উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পরিকল্পনা একটি গতিশীল, যুক্তিগ্রাহ্য, মানসিক এবং বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রক্রিয়া যা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য স্থির এবং ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় সবচেয়ে সম্ভাব্য উপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করে।

কেন করবেন পরিকল্পনা

ইংরেজীতে একটি কথা আছে– 'If you fail to plan; you really plan to fail' অর্থাৎ 'যদি তুমি

পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হও; তাহলে তুমি ব্যর্থ হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করলে।' ব্যক্তি ও সংগঠনের জন্য পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রাণপণে যারা দিগ্বিদিক ছুটে চলছে তারা নয়; বরং পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়া মানুষরাই গন্তব্যে পৌছে, অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে লক্ষ্য অর্জনে। কর্মে ভারাক্রান্ত জীবন যাপন নয়, তারা উপভোগ করে সুন্দর কর্মছন্দ। তাই–

প্রথমত: পরিকল্পনা হলো রোড ম্যাপের মত। ম্যাপে একবার চোখ বুলাতে পারলে সুস্পষ্ট হয়ে যায়- কতোটা পথ এলাম এবং গন্তব্যে পৌছতে হলে আরো কতোটা পথ যেতে হবে। ফলে সময় ও সামর্থ্যকে কাজে লাগানো যায় অর্থপূর্ণভাবে।

দ্বিতীয়ত: যার একটি পরিকল্পনা আছে, জীবনের উপর অন্যদের চেয়ে তার নিয়ন্ত্রণ বেশী। প্রতিটি ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা তার জন্যে সহজ। যারা পরিকল্পনা করতে বা প্রস্তুতি নিতে অভ্যস্ত, তাৎক্ষণিক যে কোনো প্রলোভনের ফাঁদে তাদেরকে আটকে ফেলা দুষ্কর।

তৃতীয়ত: প্রতিদিনের কাজে ছোটো ছোটো পরিকল্পনা ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। কারণ ছোটো - বড় লক্ষ্য অর্জনে প্রতিনিয়ত তাকে বাছাই করতে হয় কোনটি জরুরী, কোনটি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটি না হলেও চলবে।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রশান্তি ও সুখের জন্যেও পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। শেষ মুহূর্তের জন্যে কাজ ফেলে রাখা বা অন্যের আশায় বসে থাকা- এই দু'টি বৈশিষ্ট্যই মানসিক অস্থিরতার ক্ষেত্রে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কাজ সম্পাদনের তৃপ্তি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়ায়, তেমনি সৃষ্টি করে মানসিক প্রশান্তি।

পরিকল্পনা ও নতুন বছর

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশনের তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, ৯৩% মানুষ নতুন বছরকে কেন্দ্র করে কোনো না কোনো পরিকল্পনা করে থাকে, যার আরেক নাম নিউ ইয়ার রেজ্যুলেশন। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় ৪৫% মানুষই বছরের দ্বিতীয় মাসে হাল ছেড়ে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের হার্টফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রিচার্ড ওয়াইজম্যানের গবেষণা মতে, সারা বিশ্বে এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করা মানুষের ৮৮% ব্যর্থ হয় তা পূরণ করতে। এর কারণ ও সমাধান অনুসন্ধানে উঠে এসেছে বাস্তবসম্মত কিছু করণীয়:

১. ইচ্ছাশক্তি বাড়ান

নতুন বছর এলো হঠাৎ করেই সব বদলে যাবে, শুভ পরিবর্তন আসতে থাকবে নিজের মধ্যে এবং চারপাশে– এ চিন্তা আকাশ কুসুম কল্পনার শামিল। কোনো লক্ষ্য অর্জন বা ব্যক্তিগত অভ্যাস পরিবর্তনের জন্যে চাই ইচ্ছা শক্তি। ব্যক্তির চাওয়া যত বেশী হবে, ইচ্ছা শক্তির বিনিয়োগ করা চাই সেই অনুযায়ী। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, ইচ্ছা শক্তি জন্মসূত্রে পাওয়া কোনো বৈশিষ্ট্য নয়; বরং তা অর্জন করা যায়, এমনকি ধাপে ধাপে বাড়ানোও যায়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে নিয়মিত পরিকল্পনায় চোখ বুলানো, মনোযোগ স্থাপন এবং ইচ্ছাশক্তি তীব্রতর করা। কারণ নিজের ভিতরে ডুব দেওয়া ছাড়া নিজের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা যায় না।

২. প্রত্যাশা হবে বাস্তবসম্মত

চারপাশের মানুষ সাম্প্রতিক সময়ে কী কী করছে বা আপনাকে তারা কেমন দেখতে চায়– এর ভিত্তিতে নয়, নতুন বছরে আপনি প্রকৃতই নিজেকে এবং আপনার সংগঠনকে কোন অবস্থানে দেখতে চান সেই

অনুসারে লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। সেইসাথে মনে রাখুন, নিজের উপর মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা চাপানো হলো কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই কয়েক হাজার ফুট উঁচু পর্বতে আরোহণ করার মতো। তাই অর্জনযোগ্য লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য প্রয়াস চালাতে হবে প্রতিদিন।

৩. লক্ষ্য সুস্পষ্ট করুন

চাওয়াকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। যেমন ওজন নিয়ন্ত্রণ, জলদি ঘুম থেকে উঠা– এগুলো লক্ষ্য হিসেবে অস্পষ্ট। সিদ্ধান্ত আসতে হবে কত কেজি ওজন কমাতে চান বা প্রতিদিন সকালে কয়টায় ঘুম থেকে উঠতে চান। এর পাশাপাশি কাজের দিক-নির্দেশনাও দিতে হবে মনকে। কাঙ্ক্ষিত ওজন পেতে করণীয় হিসেবে রাখতে হবে প্রতিদিন হাঁটা ও ব্যায়ামের রুটিন। ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠতে হলে সবরকম ডিজিটাল ডিভাইস বন্ধ করে রাত ১১টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ প্রত্যাশার দীর্ঘ তালিকা দিয়ে মনকে কাজে নামিয়ে দিলেই চলবে না, তাকে সহযোগিতা করতে হবে সার্বক্ষণিক সহযোদ্ধার মতো।

৪. বদলে ফেলুন আপনার পরিমণ্ডল

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত, যাদের ইচ্ছাশক্তি তুলনামূলক বেশী এবং যারা লক্ষ্যের জন্যে নিরলস কাজ করতে পারে, তাদের আরেকটি সহজাত পারদর্শিতা থাকে। তা হলো, নিজের বলয়কে তারা আত্মবিকাশের অনুকূল করে রাখতে পারে। অর্থাৎ লক্ষ্য থেকে সরিয়ে নিতে পারে, এমন সব পরিবেশ এবং মানুষদের সান্নিধ্য থেকে তারা বেরিয়ে আসে প্রথম সুযোগেই। তাই যদি একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে চান বড় অর্জনের জন্যে, তাহলে আলস্যপ্রিয় নেতিবাচক মানুষদের সঙ্গ বর্জন করুন। ত্যাগ করুন অর্থহীন আড্ডা ও ক্ষতিকর পরিমণ্ডল। ভার্চুয়াল ভাইরাস তথা- স্মার্টফোন, ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইত্যাদির প্রতি আসক্তি থেকে দূরে থাকুন। বেছে নিন এমন কোনো সৎসঙ্গ; যেখানে রয়েছে প্রত্যয় ও ইতিবাচকতার চর্চা। যারা সকলেই কোনো না কোনো বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

৫. জানুন কেন-র উত্তর

রুটিন অনুসরণ বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মানসে নিজের প্রতি অতিমাত্রায় কঠোর ও নির্মম হবেন না। জোর প্রয়োগ করে রাতারাতি যে পরিবর্তন, তা স্থায়ী হয় না। বরং কোনো কিছুকে কল্যাণকর জেনে ভেতর থেকে যখন কেউ অনুপ্রাণিত হয়, তখনই আসে স্থায়ী বদল। তাই আগে নিজের কাছে স্পষ্ট করুন 'কেন'-র জবাব। তাহলে যে কোনো শ্রমসাপেক্ষ কাজ হবে সহজ ও আনন্দময়।

৬. কাজ শুরু করবেন আজই

কাজ সম্পন্ন করার দৌড় পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ হলো 'আজ নয় আগামী কাল করব'– এই দুষ্টচক্র, যার আরেক নাম দীর্ঘসূত্রিতা। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ভাষায়, গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর উক্তি– 'একটি কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তা শুরু করা।' সেই হিসেবে বছরের শুরুটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নতুন বছরে শুধু আজকের কাজ আজই করার গুণটি যদি আয়ত্ত করা যায়, তাহলে অনেক কিছুই চলে আসবে নিজের আয়ত্তে। দূর হবে সময়ের সাথে পাল্লা দেওয়ার অহেতুক টেনশন, মুক্তি পাবেন জমে থাকা কাজের চাপ এবং অপরাধবোধ থেকে। আপনার চারিপাশ আপনার অনুপ্রেরণার আলোয় আলোকিত হবে। তাই প্রতিদিনের কাজের তালিকা সাথে রাখুন এবং সময়কে কাজে লাগান। এতে দিনের সমাপ্তি ঘটবে তৃপ্তি নিয়ে; আর প্রতিটি দিন শুরু করতে পারবেন নতুন কর্মোদ্যমে।

ICT Tools for Da`wah and Communication

Md. Ariful Islam Apu

Data, Information, Knowledge, and Wisdom

According to Russell Ackoff, a systems theorist and professor of organizational change, the content of the human mind can be classified into five categories:

1. **Data:** symbols, signals, messages, events
2. **Information:** data that are processed to be useful; provides answers to "who", "what", "where", and "when" questions
3. **Knowledge:** application of data and information; answers "how" questions
4. **Understanding:** appreciation of "why"
5. **Wisdom:** evaluated understanding.

Ackoff indicates that the first four categories relate to the **past**; they deal with what has been or what is known. Only the fifth category, wisdom, deals with the **future** because it incorporates vision and design. With wisdom, people can create the future rather than just grasp the present and past. But achieving wisdom isn't easy; people must move successively through the other categories.

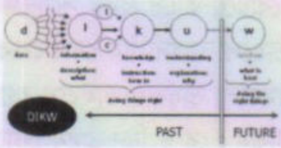

The following diagram represents the transitions from data, to information, to knowledge, and finally to wisdom, and it is understanding that support the transition from each stage to the next. Understanding is not a separate level of its own.

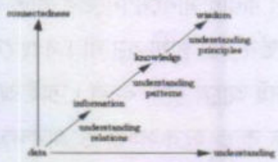

Communication Model and its Elements

Communication may be defined as a process concerning exchange of information, facts or ideas between persons holding different positions in an organization to achieve mutual harmony. The communication process is dynamic in nature rather than a static phenomenon. The Communication model has a sender who is sending the message and the receiver who is receiving the message. In between, the speech or ideas need to be simple enough to be decoded and understood by the receiver. If the ideas are not presented properly, then decoding is improper and the receiver does not understand.

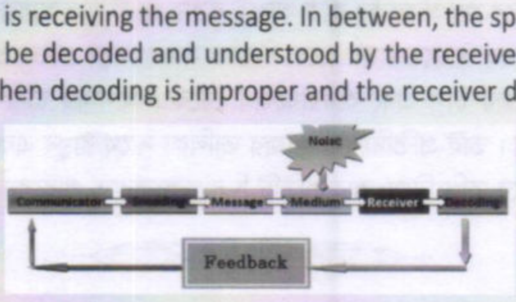

The basic flow of communication can be seen in the diagram below. In this flow, the sender sends a message to the receiver and then they share the feedback on the communication process.

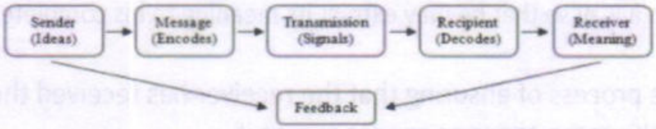

The methods of communication too need to be carefully considered before you decide on which method to uses for your purposes. Not all communication methods work for all transactions.

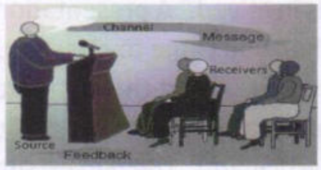

Major elements of communication process are: (1) sender (2) ideas (3) encoding (4) communication channel (5) receiver (6) decoding (7) feedback (8) context (9) environment (10) noise/interference.

Communication process as such must be considered a continuous and dynamic inter-action, both affecting and being affected by many variables.

(1) Sender

The person who intends to convey the message with the intention of passing information and ideas to others is known as sender or communicator.

(2) Ideas

This is the subject matter of the communication. This may be an opinion, attitude, feelings, views, orders, or suggestions.

(3) Encoding

Since the subject matter of communication is theoretical and intangible, its further passing requires use of certain symbols such as words, actions or pictures etc. Conversion of subject matter into these symbols is the process of encoding.

(4) Communication Channel

The person who is interested in communicating has to choose the channel for sending the required information, ideas etc. This information is transmitted to the receiver through certain channels which may be either formal or informal.

(5) Receiver

Receiver is the person who receives the message or for whom the message is meant for. It is the receiver who tries to understand the message in the best possible

manner in achieving the desired objectives.

(6) Decoding

The person who receives the message or symbol from the communicator tries to convert the same in such a way so that he may extract its meaning to his complete understanding.

(7) Feedback

Feedback is the process of ensuring that the receiver has received the message and understood in the same sense as sender meant it.

(8) Context

"The context of the communication interaction involves the setting, scene, and expectations of the individuals involved." A presentation or discussion does not take place as an isolated event. When you came to class, you came from somewhere. So did the person seated next to you, as did the instructor. The degree to which the environment is formal or informal depends on the contextual expectations for communication held by the participants. The person sitting next to you may be used to informal communication with instructors, but this particular instructor may be used to verbal and nonverbal displays of respect in the academic environment.

(9) Environment

"The environment is the atmosphere, physical and psychological, where you send and receive messages." The environment can include the tables, chairs, lighting, and sound equipment that are in the room. The room itself is an example of the environment. The environment can also include factors like formal dress that may indicate whether a discussion is open and caring or more professional and formal. People may be more likely to have an intimate conversation when they are physically close to each other, and less likely when they can only see each other from across the room. In that case, they may text each other, itself an intimate form of communication. The choice to text is influenced by the environment. As a speaker, your environment will impact and play a role in your speech. It's always a good idea to go check out where you'll be speaking before the day of the actual presentation.

(10) Noise/Interference

Interference, also called noise, can come from any source. "Interference is anything that blocks or changes the source's intended meaning of the message. For example, if you drove a car to work or school, chances are you were surrounded by noise. Car horns, billboards, or perhaps the radio in your car interrupted your thoughts, or your conversation with a passenger. Psychological noise is what happens when your thoughts occupy your attention while you are hearing, or reading, a message. Interference can come from other sources, too. Perhaps you are hungry, and your attention to your current situation interferes with your ability to listen. Noise interferes with normal encoding and decoding of the message carried by the channel between source and receiver. Not all noise is bad, but noise interferes with the communication process.

Types of Communication

Communication today is mainly of three types:

- **Written communication,** in the form of emails, letters, reports, memos and various other documents.
- **Oral communication.** This is either face-to-face or over the phone/video conferencing, etc.
- A third type of communication, also commonly used but often underestimated is **non-verbal communication,** which is by using gestures or even simply body movements that are made. These too could send various signals to the other party and is an equally important method of communication.

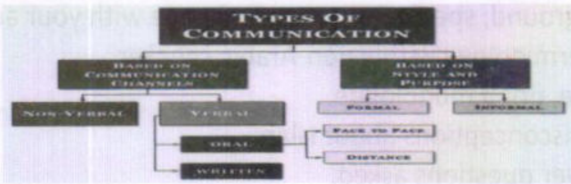

As you can see, there are at least 6 distinct types of communication: **non-verbal,verbal-oral-face-to-face,verbal-oral-distance, verbal-written, formal** and informal types of communication. Add to this the boundless opportunities the internet superhighway offers, and you have an absolute goldmine of communication possibilities!

Inter Personal, Group, and Mass Communication

Inter-personal communication is a type of communication occurring within the mind of a person. On average half or more of the working time of an organization is spent in inter-personal communication.

Group communication is the exchange of information and ideas between individuals using interpersonal skills. There are several ways in which groups can communicate for example phone calls, emails, face-to face conversations, and memos. In group communication team member has to actively participate for an effective communication. So in group communication every member must properly listen, deal with conflict, and respect others opinions.

Mass communication is the process of imparting and exchanging information through mass media to large segments of the population. It is usually understood for relating to various forms of media, as these technologies are used for the dissemination of information, of which journalism and advertising are part of.

Requirements for Da'wah

Pre-requisite for Da'wah:

- Knowledge
- Kindness/Gentleness
- Wisdom
- Speaking a common language
- Convenient location

- Patience
- Morality

While engaging in da'wah, Muslims benefit from following these Islamic guidelines, which are often described as part of the "methodology" or "science" of da'wah.

- Listen! Smile!
- Be friendly, respectful, and gentle.
- Be a living example of the truth and peace of Islam.
- Choose your time and place carefully.
- Find common ground; speak a common language with your audience.
- Avoid Arabic terminology with a non-Arabic speaker.
- Have a dialogue, not a monologue.
- Clear up any misconceptions about Islam.
- Be direct; answer questions asked.
- Speak with wisdom, from a place of knowledge.
- Keep yourself humble; be willing to say, "I don't know."
- Invite people to an understanding of Islam and tawhid, not to membership in a particular mosque or organization.
- Do not confuse religious, cultural, and political issues.
- Do not dwell on practical matters (first comes a foundation of faith, then comes day-to-day practice).
- Walk away if the conversation turns disrespectful or ugly.
- Provide follow-up and support for anyone who expresses interest in learning more.

Do's and Don'ts when Giving Dawah to Non-Muslims

- Do Not Always Point out Faults in Their Religion
- Try to Find Some Common Ground
- Choose Your Words Carefully
- Do Not Be a Hypocrite
- Physical Appearance
- Do Not Insult
- Do Not Go Deep Into Subject You Know Nothing About
- Use Common Sense
- Be Smart
- Avoid Controversial Issues
- Bring Proofs about Our Religion

ICT tools for Dawah and Communication

Issues to be careful while choosing ICT tools for Dawah and/or communication.

- Accessibility
- Accuracy

- Encryption (security)
- Reach (spread) and richness (depth)
- Personalization
- Feedback
- Timing issue
- Cost (money, time, energy)

For Inter Personal Dawah and Communication

- Phone call
- SMS
- Email
- Instant messaging

For Group Dawah and Communication

- Conference Phone call
- Group SMS
- Group Email
- Social network groups
- Group messaging
- Shared documents

For Mass Dawah and Communication

- Blogs
- Wikis
- Social networks
- YouTube

ICT tools for Dawah and Communication Management

By using these tools we can keep records of the knowledge, its sources, people met and about them, contacts, meeting minutes, issues about individuals etc.

- Google sheet
- Google doc
- MS Excel
- Online drives (virtual drive/space)
- Database management software
- MS Word

জঙ্গিবাদ : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ

ভূমিকা

বর্তমান পৃথিবীর সবচে আলোচিত বিষয়গুলির একটি হল 'টেররিজম' বা 'সন্ত্রাসবাদ'। 'সন্ত্রাসবাদ'-কে 'জঙ্গিবাদ'ও বলা হয়ে থাকে। নাইন ইলেভেনের পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'অনড় যুদ্ধ' ঘোষণা করেন, যাকে বুশ 'ক্রুসেড' নামেও আখ্যায়িত করেন। একবিংশ শতকে আমেরিকার ঘোষিত এই নয়া ক্রুসেড পৃথিবীর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসকে নতুন পথে প্রবাহিত করেছে। জঙ্গি, সন্ত্রাস, চরমপন্থা শব্দগুলো প্রায় সমার্থবোধক হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এদেশে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে শ্রেণি-গোষ্ঠী বিবেচনা করে এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ

জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ইংরেজি militant, militancy শব্দদ্বয়ের প্রতিশব্দ। জঙ্গি একইসাথে একটি বিশেষণ ও একটি বিশেষ্য এবং সাধারণত পুরোদমে সক্রিয়, যুদ্ধাংদেহী-মনোভাবাপন্ন ও আগ্রাসী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি ১৫শ শতকের লাতিন "militare" শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ একজন সৈনিকের ন্যায় দায়িত্ব পালন করা। এগুলো এখন আমাদের মধ্যে অতি পরিচিত ও অতি ব্যবহৃত শব্দ। যদিও শব্দগুলি কিছুকাল আগেও এতো প্রচলিত ছিলো না এ জনপদে। আভিধানিক বা ব্যবহারিকভাবে শব্দগুলো নিন্দনীয় বা খারাপ অর্থেও ব্যবহৃত হতো না। শাব্দিক বা রূপকভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বুঝাতে এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হতো। উর্দু ও হিন্দী ভাষার জঙ্গ শব্দ যুদ্ধ অর্থে প্রচলিত। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো, শক্তিমান বা যুদ্ধাংদেহী বুঝাতে এ শব্দ ব্যবহার করা হতো।

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে "Militant. Adjourning the use of force or strong pressure to achieve one's aim" অর্থাৎ "মিলিট্যান্ট (জঙ্গি) : যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করা সমর্থন করে।

এ অর্থে বলা যায় অনেক রাজনৈতিক, আদর্শিক, পেশাজীবি ও সামাজিক দলই 'মিলিট্যান্ট' বা জঙ্গি। কারণ সকলেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা প্রেসার প্রয়োগ পছন্দ করেন এবং সকলেই তাদের নিজেদের আদর্শ স্বার্থ রক্ষায় বা প্রতিষ্ঠায় জোরালো ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু আমরা বতর্মানে 'জঙ্গি' বলতে বুঝি বে-আইনি সহিংসতা ও খুন-খারাবি। যদিও এ অর্থ বুঝাতে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিতি পরিভাষা হলো সন্ত্রাস (Terrorism)। আমরা শব্দগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের মতো করে দৃষ্টিভঙ্গি বানিয়ে নিয়েছি। যেমন:

- যারা জাগতিক কোনো আদর্শবাদ যেমন সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা সর্বহারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, সহিংসতা, অস্ত্রধারণ বা খুন-খারাবিতে লিপ্ত হন তাদেরকে আমরা চরমপন্থী (Extremist) বলি।
- যারা ইসলামের নামে বা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে ঢাল করে উগ্রতা, সহিংসতা, অস্ত্রধারণ বা খুন-খারাবিতে লিপ্ত তাদেরকে আমরা বলি 'জঙ্গি'।
- আর যারা প্রচলিত সাধারণ রাজনৈতিক দলের নামে বা কোনো দল, মতবাদ বা আদর্শের নাম না নিয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যে উগ্রতা, সহিংসতা, অস্ত্রধারণ বা খুন-খারাবিতে লিপ্ত হয় তাদেরকে সন্ত্রাসী বলি।

এরূপ বিভাজন বা পার্থক্যের কোনো ভাষাগত বা তথ্যগত ভিত্তি নেই। বরং ইংরেজি ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, militant/militancy জঙ্গি বা জঙ্গিবাদ শব্দটি সরাসরি 'বে-আইনী কর্ম' বা অপরাধ বুঝায় না। বরং বেআইনি বা আইন-সম্মত যেকোনো প্রকারের উগ্রতা বুঝাতে জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ (Militant, militancy) শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়। চরমপন্থা ও চরমপন্থী (Extremism/Extremist) শব্দদ্বয়ও সরাসরি অপরাধ বা বেআইনি কর্মকাণ্ড বুঝায় না। পক্ষান্তরে সন্ত্রাস (Terrorism) শব্দটিই কেবল সরাসরি অপরাধ ও বেআইনি কর্মকাণ্ড বুঝায়।

জঙ্গিবাদের সূচনা ও ক্রমবিবর্তন

জঙ্গিবাদের ইতিহাস অনেক পুরনো। এটা মানবের বিকাশের সাথে সাথে জন্ম হয়েছে। সন্ত্রাসের ইতিহাস ততটুকুই পুরনো যখন থেকে মানুষ রাজনীতিকে প্রভাবিত করার জন্য হিংস্রতার ব্যবহার করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সন্ত্রাস বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে ছিল, এবং এটি ইউরোপ থেকে মধ্য প্রাচ্যের সকল স্থানেই ছিল। তবে ধরন ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এর ইতিহাস যতটুকু মধ্য প্রাচ্যের ততটুকুই ইউরোপিয়ান, এবং যতটুকু ধর্মীয় ঠিক ততটুকু সেকুলার বা ইহজাগতিক বা ধর্মনিরপেক্ষ। ধারণা করা হয়, পৃথিবীতে প্রথম সন্ত্রাসের ব্যবহার হয়েছিল দখলদার রোমানদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ইহুদীদের দ্বারা। সিকারিরা (Sicarii) ছিল প্রথম শতাব্দীর ইহুদীদের দল যারা শত্রু এবং তাদের সাহায্যকারীদের হত্যা করেছিল রোমান শাসন থেকে জুদায়াকে (জেরুজালেম) মুক্ত করতে। ইসমাইলি হাসা-সিন বা আল হাসা-সিন (এখান থেকে এসাসিন শব্দের উৎপত্তি)-দের কেও এক অর্থ সন্ত্রাসী বলা যায়, যারা নিজেদের রাজনীতির প্রয়োজন গুপ্তহত্যা চালাত। আধুনিককালে পৃথিবীর প্রথম সন্ত্রাস দেখা যায় ফ্রান্সে। সন্ত্রাসের প্রথম সংজ্ঞা দেয়া হয় ফ্রেঞ্চ একাডেমী থেকে ১৭৯৮ সালে, যা ছিল 'ত্রাসের শাসন অথবা ব্যবস্থা'। এর ফলে বলা যায় সব থেকে ভয়ংকর সন্ত্রাস হল স্বৈরাচার সরকার যখন নিজের নাগরিকদের উপর সন্ত্রাস চালায়। টেররিজম যেকোনো আইডলজি বা ধর্ম বা মতবাদ থেকে আসতে পারে। টেররিজম নিজে কোনো মতবাদ নয়, এটার কোনো সম্মিলিত রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই; প্রকৃতপক্ষে, যেকোনো মতবাদ একজন সন্ত্রাসীর দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে।

'টেরোরিজম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রেঞ্চ দার্শনিক ফ্রাঙ্কোস নোয়েল বাবেউফ, ১৭৯৪ সালে। ফরাসি বিপ্লবের পর প্রথম ফ্রেঞ্চ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পরে, ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত যে ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ফ্রান্সে সংঘটিত হয়, ইতিহাসে তা 'রেইন অফ টেরর' বা 'দ্য টেরর' নামে পরিচিত। সেসময় অবশ্য শব্দটা পজিটিভ অর্থেই ব্যবহার করেছিল নবগঠিত ফ্রান্সের বিপ্লবী শাসকগোষ্ঠী। এখন 'টেরোরিজম'কে সাধারণত সরকার বা প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের বিদ্রোহ হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু শুরুতে ব্যাপারটি এমন ছিল না। তখন বরং সরকার কর্তৃক প্রতিবিপ্লবী, বিদ্রোহী বা ফ্রান্সের নয়া শাসকরা যাদের 'জনতার শত্রু' বলে ঘোষোণা দিত, তাদের 'জনতার আদালতে' বিচারকেই শাসকগোষ্ঠী 'টেরোর' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নায়ক ম্যাক্সিমিলিয়েন রবস্পিয়ের বিশ্বাস করতেন, জনগণতন্ত্রের যেকোনো সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো 'নৈতিকতা', কিন্তু 'নৈতিকতা'কে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই 'টেরর' জরুরি। এ ব্যাপারে তার বিখ্যাত উক্তি হলো: 'নীতিহীন সন্ত্রাস শয়তানের কাজ, আর সন্ত্রাসহীন নীতি হল অকাজ। সন্ত্রাস মূলত নৈতিকতার জন্মদান।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, সন্ত্রাসবাদের এই পজেটিভ সংজ্ঞা বিদ্রোহ অর্থে পরিবর্তিত হয়। ১৮৮০-৯০-এ, তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আর্মেনিয়ানরা এই সন্ত্রাসবাদী পন্থায়ই বিদ্রোহ করেছিলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, বিশ শতকের ত্রিশের দশকে, সন্ত্রাসবাদের এই সংজ্ঞা আরেকবার পরিবর্তিত হয়। এসময়, সন্ত্রাসবাদের আগের অর্থ, স্টেট বা গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতদের বিদ্রোহ পালটে যায় এবং কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র বা শাসককর্তৃক জনগণের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনকেই এসময় 'টেরোরিজম' নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিটলারের নাৎসিবাহিনী বা মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট মতবাদ অথবা রাশিয়ায় স্টালিনের শাসনকে একারণেই 'টেরোরিজম' আখ্যা দেয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, উপনিবেশিত ভূখণ্ড গুলিতে নয়া জাগরণের প্রেক্ষিতে, সন্ত্রাসবাদের অর্থ আরেকবার পরিবর্তিত হয়। এসময়, এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে জাতিবাদের উন্মেষ ঘটে, এবং কলোনিয়াল (উপনিবেশ) শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও তৎপরতা তৈরি হয়। একে ইউরোপ তখন 'টেরোরিজম' নামে অভিহিত করে। অবশ্য, বিশ্বব্যাপী কলোনিয়ালিজমের পতনের পরে, এই বিদ্রোহীদের আর টেরোরিস্ট বলা সম্ভব হয় নাই। কারণ, ততদিনে অনেক দেশই স্বাধীন হয়ে যায় এবং এই 'টেরোরিস্ট'রা বীরের মর্যাদা পেয়েছে। তাদের নতুন নাম হয়েছে 'ফ্রিডম ফাইটার'। এ ব্যাপারে পিএলও-র চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এক ভাষণে বলেন, 'সন্ত্রাসী আর বিদ্রোহীর পার্থক্য হলো, তাদের কাজের কারণ ও লক্ষ্য আলাদা। যে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায় এবং দখলদার ও উপনিবেশের হাত থেকে নিজ জাতিকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করে, তাকে 'সন্ত্রাসী' বলা যায় না।' কলোনিয়ালিজমের পতনের পরেও, নিও কলোনিয়াল প্রেক্ষিতে, স্বাধীন দেশগুলোতে বিভিন্ন আন্তঃজাতিবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হয়, যেগুলোকে 'সন্ত্রাস' নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে, রাশিয়ার পতনের পরে, তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন হওয়া নানা দেশে এবং কম্যুনিস্ট বিপ্লবের লক্ষ্যে নানা সশস্ত্র গ্রুপ তৈরি হয়। এদেরকেও 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।

ষাট-সত্তরের দশক পর্যন্ত 'টেরোরিজম' এই অর্থেই চালু থাকে। পরে 'কোল্ড ওয়ার' বা 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ/স্নায়ুযুদ্ধ'র কালে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন কম্যুনিস্ট শক্তির সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক নানারকম স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এসময় 'টেরোরিজম' শব্দটি আগের চাইতে অনেক বৃহত্তর অর্থে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়। আশির দশকের শুরুতে আমেরিকার রিগ্যান প্রশাসন কম্যুনিস্টবিরোধী কৌশলের অংশ হিসেবে 'টেরোরিজম' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুরু করে। বিশ্বব্যাপী ছোট ছোট বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র আন্দোলনগুলোকে আমেরিকা ও পশ্চিমা তথাকথিত উদারনীতিবাদী সোসাইটির বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট ব্লকের বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করা হয়।

মুসলমান ও জঙ্গিবাদ

গত শতকের শুরুতে তুরস্কের অটোমান শাসনের পতন ঘটে এবং মুসলমানদের দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্ব শাসনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। এসময় বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশগুলোর বেশিরভাগই ইউরোপের কলোনি ছিল, এবং উসমানী শাসনের বিলুপ্তির প্রেক্ষাপটেই মূলত, মুসলিম দেশগুলোয় কলোনির বিরুদ্ধে জাতিবাদী বিদ্রোহের সূচনা হয়। গোটা আরব অঞ্চলসহ মুসলিম জাহান এসময় আরব ইসলামী জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিমা কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে লিপ্ত হয়। এমনকি ভারত উপমহাদেশেও মুসলমানরা প্রথম ব্যাপকভাবে জাতিবাদী স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দেয় 'খেলাফত আন্দোলনে'র মধ্য দিয়েই।

ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্ব, আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহতিসাব

মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন

.إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

ঘটনাবহুল বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতকের এমন এক সংকটময় মূহুর্তে আমরা অবস্থান করছি, যখন এক অশুভ শক্তির মদদে মুসলিম বিশ্বে তথা মধ্যপ্রাচ্য আজ মৃত্যুপূরীতে পরিণত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে ১৮টি বছর বিশ্ব চরাচরে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেল, যা ইতিহাসের পাতায় কালো অধ্যায় হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতেও ইতিহাসের অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের উত্থান এবং নিজ দেশে সত্তর বছরের মাথায় তার সমাধি। দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ, বহু মানব সন্তানের আত্মদান, দুই জার্মানির একত্রীকরণ, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান, পৃথিবীর দিকে দিকে স্বাধীনতা আন্দোলন, উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের দুঃশাসন ও নির্যাতন থেকে অর্ধশত মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জন, অন্যদিকে দেশে দেশে মুসলিম নিধন, ইহুদীদের দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস দখল ও অগ্নি সংযোগ, আরব ও ইসরাইল যুদ্ধ, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসভা ও যুগোস্লাভিয়ায় মুসলিম গণহত্যা, চারশ বছরের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মাণের ঘৃণিত আদালতের সিদ্ধান্ত, পৃথিবীর ভুস্বর্গ কাশ্মীরে মুসলিম হত্যা এসবই বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ট্রাজেডি।

১১ই সেপ্টেম্বর ইস্যুতে একবিংশ শতকের শুরুতে আফগানিস্তান এবং হাজার বছরের মুসলিম সভ্যতা ও সমৃদ্ধির নগরী বাগদাদসহ ইরাকে অসংখ্য নিরাপরাধ-নিষ্পাপ বনি আদমের নৃশংস হত্যার বীভৎস দৃশ্য আমরা দেখেছি, আজও দেখছি!

পৃথিবীর মুসলমানদের হৃদয়ে লেখা এক রক্তাক্ত জনপদের নাম ফিলিস্তিন, তেমনি আরো শহীদী জনপদের নাম সিরিয়া ও আরাকান। সিরিয়ার নিষ্পাপ শিশুদের আর্তনাদ, মা বাবার কান্না, আহাজারি, শহীদদের সারি সারি লাশ, বোমা নিক্ষেপে ভষ্মীভূত ঘর-বাড়ির ধ্বংসলীলা, অসংখ্য নবী রাসূলের পদধূলিতে ধন্য সিরিয়ার হিমেল ও শান্তির বাতাস আজ লেলিহান অগ্নি শিখায় পরিণত হয়েছে। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আজ মুক্তিকামি জনাতার রক্তে সিক্ত। পাষণ্ড হিন্দুত্ববাদী উন্মাদ সামরিক বাহিনীর বুলেটের আঘাতে নিরাপরাধ মুসলিম শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষের পবিত্র দেহ আজ ক্ষত-বিক্ষত। স্বতী-সাধ্বী মুসলিম মা বোনদের উপর হায়না সৈন্যদের পৈশাচিক কায়দায় বলাৎকারের সংবাদে বিশ্ববাসী আজ স্তম্ভিত।

আমাদের মাতৃভূমিও আজ এর বাইরে নয়। সাম্রাজ্যবাদ, বাণিজ্যিক আগ্রাসন এবং ভোগবাদী সংস্কৃতি ও তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের যাঁতাকলে মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত। বিশেষ করে বিজাতীয় নোংরা রুচিহীন নগ্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নৈতিক অবক্ষয় এবং মাদক দ্রব্যের হিংস্র ছোবলে দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী (ছাত্র ও যুব সমাজ) তরুণ প্রজন্ম মনুষ্যত্ব বিবর্জিত অজানা শংকায় পথহারা ভয়ংকর অন্ধকারে নিমজ্জিত। যার ফলশ্রুতিতে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বুয়েটের মেধাবী ছাত্র নয় বরং বহু শিক্ষাঙ্গনেই এক আবরার ফাহাদ এর অন্তরালে শত শত আবরার নির্মম মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছে।

প্রিয় ভ্রাতৃবর্গ! বিপদ সংকুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করে শিরক বিদ'আত কুসংস্কারে পুঞ্জীভূত জনপদে তাওহীদের পতাকা নিয়ে নির্যাতিত জনতার মুক্তির দিশারী হিসেবে শুব্বানকে এগিয়ে আসতে হবে। শুব্বানের গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উপর জাতির কর্ণধার ছাত্র-যুব সমাজের ভবিষ্যত কল্যাণ নির্ভর করছে।

আজকের কর্মশালার সর্বস্তরের যুবক, ছাত্র ভাইদেরকে একটি কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিয়ে মূল আলোচনায় যেতে চাই। কোন মূহূর্তেই আমরা যেন ভুলে না যাই যে, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকটে জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রিত গোলাম।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . (সূরা তাওবা: ১১১)

সুতরাং আজকের এই কর্মশালায় যে ভাইয়েরা উপস্থিত হয়েছেন মূলত তারাই সফলকাম। আর তাদের দায়িত্বও বিশাল বটে। প্রিয় ভাইয়েরা, শিরক ও বিদআত মূলোৎপাটন করত মানব রচিত সকল মতবাদের উপর কুরআন এবং সুন্নাহকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে সকল যুগে সকল দেশে আহলে হাদীস সংগ্রাম ছিল অবিরাম। আমাদের পাক ভারতীয় মহাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৮৩১ সালে বালাকোটসহ অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা আমাদের যুগে যুগে প্রেরণা যোগায়। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। ১৯৫৫ সালে দেশের ইসলামী দলগুলোর সমন্বয়ের বহুদলীয় ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট এর ঐতিহাসিক কনফারেন্স ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ) নেতৃত্বে।

আজকে আমাদের আলোচ্যবিষয় হলো, নেতৃত্ব, আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহ্‌তিসাব। নেতৃত্ব বা ইমারত হচ্ছে, দলীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং সাংগঠনিকভাবে দলকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গতিশীল, পরিচ্ছন্ন নেতৃত্বের উপস্থিতি অপরিহার্য।

নেতৃত্ব কীঃ

নেতৃত্ব হচ্ছে, যেকোন দলকে সংঘবদ্ধভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার একটি শক্তিশালী কৌশল, যাতে দলীয় কর্মীরা তাদের সম্ভাব্য সর্বাধিক সামর্থ অনুযায়ী উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সর্বদা তৎপর থাকে।

জে. আর. টেরি বলেন, পারস্পরিক লক্ষ্য অর্জনে স্বেচ্ছায় সংগ্রাম করতে গিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করার যে বিশেষ গুণ, তাই নেতৃত্ব। অন্যভাবে বলা যায়, নেতৃত্ব হলো সেই গুণ, যে গুণের মাধ্যমে অন্যের দ্বারা কাজ করে নেয়ার ক্ষমতা তৈরি হয়। মূলতঃ নেতৃত্ব হলো কিছু গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি তথা (Policy) কৌশল। আর যার মাঝে এই সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটবে তিনিই হলেন একজন যোগ্য আদর্শ নেতা বা দায়িত্বশীল।

অন্যদের ভাষায়, নেতৃত্ব হলো এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির নির্দেশনা, পরামর্শ, মেধা, ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে কোন জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। এটা একটা সামাজিক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রখ্যাত গবেষক কার্টার বলেন ঃ Leadership is the process of influencing the activities of an organized group to words goal setting and goal achievement. অর্থাৎ, নেতৃত্ব হল একটি সংগঠিত গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপকে শব্দের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্য অর্জনের দিকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া।

একটি আদর্শ সংগঠনের কতিপয় মৌলিক উপাদান রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে সেই সংগঠন পরিচালিত হয়। ১) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২) নেতৃত্ব ৩) কর্মীবাহিনী ৪) কর্মসূচী। তবে এখানে নেতৃত্ব বলতে ইসলামী নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, জামাআত (সংগঠন) ছাড়া ইসলাম কল্পনা করা যায় না এবং ইমারত (নেতৃত্ব) ছাড়া জামাআত নয়, আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নয়। (সুনানু দারেমী হা/২৫৭, সনদ দুর্বল)

নেতা এবং কর্মীদের মিলিত প্রয়াসের উপর ভিত্তি করেই কোন সংগঠনের কাজ সামনের দিকে এগুতে

থাকে। নেতৃত্ব ও কর্মীদের মাঝে সুসম্পর্ক থাকলে কাজ স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে অগ্রসর হয়। এ সম্পর্ক কাঙ্ক্ষিত ও সুদৃঢ় বা মজবুত না হলে এর গতি ব্যাহত হয়। এভাবে হোঁচট খেতে খেতে এক পর্যায়ে এসে কাজের গতি একেবারেই মন্থর হয়ে পড়ে। যোগ্য নেতৃত্ব একজন কর্মীর সাথে অপর কর্মীর সম্পর্ক মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। মালার মতো এক সুতায় গেঁথে এককে পরিণত করাই এর কাজ। হযরত মাকিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানের কোন বিষয় ও ব্যাপারে দায়িত্বশীল হলো কিন্তু তাদের (জনগণের) খেদমত ও কল্যাণের জন্য ততটুকু চেষ্টা করলো না, যতটুকু সে নিজের জন্য করে থাকে। তবে তাকে (দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে) আল্লাহ উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (আল-মুজামুস সাগীর)
নেতৃত্ব তিন রকমের হয়ে থাকে-

ক. একনায়কতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক নেতৃত্ব

১. নেতা নিজেই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন এবং তা বাস্তবায়নে অন্যের উপর চাপিয়ে দেন।
২. কেবল হুকুমদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।
৩. ক্ষমতা নিজ মুঠিতে ধরে রাখার মানসিকতা পোষণ করেন।
৪. কেবল অনুগত পছন্দসই কর্মীর সাথে সখ্যতা ও যোগাযোগ রক্ষা করেন।
৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশিসংখ্যকের বা সমষ্টির মতামত নেন না।
৬. কাজের কম বাস্তবায়ন করেন।
৭. নিজেকে ভুলত্রুটির উর্ধ্বে মনে করেন এবং সংশোধনের আপত্তি ও অনাগ্রহ এবং বিরক্তি প্রকাশ করেন।
৮. নিজের অর্জিত জ্ঞান সকলের উর্ধ্বে মনে করেন এবং অন্য বিদ্বান, বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীকে অবমূল্যায়ন করেন।

খ. পরামর্শ ভিত্তিক সকলের অংশীদারিত্বে নেতৃত্ব

১. পরামর্শ পরিষদ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু।
২. সকলে মিলে বিশদ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. গৃহীত সিদ্ধান্ত সকলে মিলে করা অর্থাৎ সকলের অংশদারিত্ব থাকা।
৪. সকল কর্মী বা অধীনস্ত নেতাদের মাঝে সার্বক্ষণিক হৃদ্যতা স্থাপন।

গ. দুর্বল ভীতু, নির্জীব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতস্তত নেতৃত্বঃ

১. কর্মী বা সদস্য যিনি যা বলেন তাতেই হ্যাঁ বলেন। ভালমন্দ স্থিরকরণে অপারগ।
২. যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা এবং যোগাযোগের প্রয়োজন মনে করেন না।
৩. নিজে যেটা ভাল বুঝেন বা চাটুকার অথবা গুণকীর্তনকারীদের বুঝটাই গ্রহণ করেন।
৪. নিজ বুঝটা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষতিকর পরামর্শককে কাজে লাগান।
৫. সিদ্ধান্তহীনতা ও বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা কর্মীকে হতাশ করে।
৬. পদলোভী, ক্ষমতা ধরে রাখার প্রবণতা।
৭. জবাবদিহিতা বিহীন এবং সন্দেহ বাতিকের ফলে নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি।

নেতৃত্বের মৌলিক গুণাবলিঃ

১। **নেতৃত্ব হতে হবে রউফুর রহীমঃ** রাসূল (সাঃ) এর নেতৃত্ব ছিল হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর কোমলতা দিয়ে ভরপুর। দুনিয়ার অন্যান্য নেতারা কর্মীদের দিয়ে কাজ আদায় করে নিলেও কোন না কোন পর্যায়ে পৌঁছে কিছু না কিছু ক্ষেত্রে অসন্তোষ প্রকাশ করে। কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর প্রতি তার সহকর্মীদের শুরু থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল অনাবিল আসক্তি, বিনম্র শ্রদ্ধা। তাইতো নেতার প্রতি

কর্মীরা জীবন উৎসর্গ করার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পেশ করলেন, উহুদ যুদ্ধের আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তালহা (রাঃ)। এ রণাঙ্গনে তালহার (রাঃ) দেহ উনচল্লিশটি আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। তাঁর শাহাদাৎ আঙ্গুলিসহ দু'টি আঙ্গুল শত্রুদের আঘাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ঐ যুদ্ধে বৃষ্টির মত তীর নিক্ষেপ হচ্ছিল আর তালহা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) কে নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন। তাইতো হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতেন, উহুদ যুদ্ধের একক কৃতিত্ব ছিল তালহা (রাঃ) এর। তাই তিনি তালহার সম্পর্কে বলতেন,

"হে তালহা, তোমার জন্যে জান্নাতসমূহ ওয়াজিব হয়ে গেছে
তুমি হুরে ঈনের নিকটে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো" (আর রাহীকুল মাখতুম পৃঃ ২৯২)

রাসুল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন শহীদকে ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করা অবস্থায় দেখতে চায় সে যেন তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে দেখে (তিরমিযি ও মিশকাত, ২য় খণ্ড)।

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.
(সূরা তাওবা-১২৮)

তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন। তিনি তোমাদেরই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্তের কারণ হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ ও কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের সার্বিক কল্যাণ কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও করুণাসিক্ত।

২। **নেতৃত্ব হবে তাক্বওয়া সম্পন্ন আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত:** ইসলামী নেতৃত্বকে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও তার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে হবে। দুনিয়ার অন্যান্য কাজ ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, গোত্র, জাতি বা দেশের জন্য করা যেতে পারে। সেখানে ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু সংস্কার আন্দোলনে ইসলামী নেতৃত্ব দুনিয়াবী স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াস চালাবে।

৩। **কর্মীদের প্রতি নেতৃত্বের কোমল আচরণ:** নেতৃত্ব হবে কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস। একটি আদর্শ সংগঠনের কর্মীদের নানামুখী কর্মে অবতীর্ণ হতে হয়। যাবতীয় কাঠিন্য বরদাশত এবং সমস্যা ও বাধা উপেক্ষা করে আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাবার মন মানসিকতা সজীব রাখার জন্য নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আদর্শিক জ্ঞানবিতরণ, সদালাপ, অমায়িক ব্যবহার এবং উন্নত চারিত্রিক প্রভাবেই কেবল নেতৃত্ব এই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُم (সূরা ফাতহ: ২৯)

হারিছ আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ইমাম বা নেতা হচ্ছেন তারা যাদেরকে তোমরা ভালবাস আর তারাও তোমাদেরকে ভালবাসেন। তারা তোমাদের জন্য দু'আ করেন এবং তোমরাও তাদের জন্য দু'আ করো। (মুসলিম, হাদীস/১৮৮৫)

৪। **নেতৃত্ব বিনম্র ভাষায় নির্দেশ দিবেন:** ইসলামী নেতৃত্বের নির্দেশ কর্মীদের পালন আল্লাহ প্রদত্ত আবশ্যিক বিধান। তবে নির্দেশ প্রদানের ভাব-ভঙ্গি ও ভাষা মোটেও রুক্ষ হওয়া যাবে না। কোন অবস্থাতেই ভদ্রতার সীমারেখা লঙ্ঘন করা উচিত হবে না। রাসূল (সাঃ) এর জীবনাচরণের সবচেয়ে বড় দিক হলো, তিনি কখনও কর্মীদেরকে গালি দেননি, বিদ্রুপ করেননি, ঠাট্টা করেননি, অপমানিত করেননি। কাউকে উপহাস করেননি। এমনকি কখনও কোন প্রশ্নকারীর প্রতি রুষ্ট হননি। ধমক দেননি কখনো। অগ্নিশর্মা হননি কারো প্রতি। কারো প্রতি কখনো ভ্রু-কুঞ্চিতও করেননি। এ ব্যাপারে তার আচরণ ছিল কুরআনেরই পূর্ণাঙ্গ নমুনা।

وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(সূরা হুজরাত: ১১)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

(সূরা লুকমান-১৮)

তার কথাবার্তায়, ব্যবহারে, মুয়ামেলাতে সব সময় কোমলতা, আর নম্রতায় ভরপুর ছিল। সেখানে ঐশী বাণীরই প্রতিফলন ঘটত।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

(সূরা আলু ইমরান: ১৫৯)

নেতার মধ্যে যে গুণাবলি বিদ্যমান থাকলে একজন স্বার্থক নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে-

১) তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।
২) চারিত্রিক মাধুর্যতা।
৩) দলের সার্বিক দায়িত্ব বহনের মানসিকতা।
৪) মন ও দৈহিক সুস্থতা।
৫) মোহনীয় ও বলিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া।
৬) মৌলিক মানবিক আচরণ অনুধাবণের ক্ষমতা।
৭) আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা।
৮) পরিচালনার ক্ষমতা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তা।
৯) নীতিবান, সাহসী, সৃজনশীল ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি।
১০) সঠিক পরামর্শ।
১১) দলীয় অবস্থা বিশ্লেষণের বিচক্ষণতা এবং দলীয় সদস্যদের আনুগত্য লাভ।

আনুগত্য

একজন জীবন্ত মানুষের শরীরের সাথে রক্তের যেমন সম্পর্ক, নেতৃত্বের সাথে আনুগত্যের তেমনি সম্পর্ক। রক্ত ছাড়া সুস্থ শরীর যেমন আশা করা যায় না, কর্মীর আনুগত্য ছাড়া তেমন নেতৃত্ব কল্পনাতীত। ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং উলুল আমর তথা আদর্শ নেতার আনুগত্য আবশ্যক। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আল কুরআনের সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে এই ঘোষণাটি দিয়েছে -

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

আনুগত্য কী?

আনুগত্য শব্দটি ৩টি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

১. সংগঠনে অর্ন্তভুক্ত হওয়া;
২. কুরবানী করা (মতের, অর্থের, সময়ের, শ্রমের, বিশ্রামের);
৩. উর্ধ্বতন ব্যক্তির/কর্তৃপক্ষের আদেশ মানা।

ইসলামী সংগঠনে আনুগত্যের গুরুত্বঃ

ক) আল্লাহর নির্দেশঃ

১. আনুগত্য করা ফরয (নিসা-৫৯)
২. হেদায়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত (নূর-৫৪)
৩. আনুগত্যহীনতা আমলকে বরবাদ করে দেয় (মুহাম্মাদ- ৩৩)

৪. ঈমানের অপরিহার্য দাবি (নূর-৫১)

৫. আনুগত্য সৎ কাজে, অসৎ কাজে নয় (মায়েদা-২)

খ. রাসূলের নির্দেশঃ

৬. পছন্দ না হলেও আনুগত্য ফরয। (বুখারী ও মুসলিম)

৭. যথাসাধ্য আনুগত্য করা ফরয। (বুখারী ও মুসলিম)

৮. আনুগত্যহীনতার পরিণাম ভয়াবহ। (জাহিলিয়াতের মৃত্যু) (ছহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৮৪৮)

৯. হাবশী গোলামও যদি আমীর হয়, তাহলেও তার আনুগত্য করতে হবে। (বুখারী)

১০. প্রাপ্য অধিকার না পেলেও আনুগত্য করতে হবে। (মুসলিম)

১১. আমীরের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য পূর্ণ হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১২. নেতার মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু দেখলে ধৈর্য-ধারণ করা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩. দায়িত্বশীলের সাথে বিতর্কে জড়ানো ঠিক নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪. দুনিয়া থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিদায়বেলায় উম্মতের জন্য পঞ্চ নির্দেশের অন্যতম একটি নির্দেশ।

১৫. আখেরাতে মুক্তির জন্য আনুগত্য দরকার।

১৬. নিজেকে নির্ভেজাল ও বিশৃঙ্খলামুক্ত রাখতে আনুগত্য আবশ্যক।

আনুগত্যহীন হলে যে কোন মূহুর্তে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারেঃ

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের আনুগত্যহীনতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। এমন এক পর্যায় এসেছিল যে, মুশরিকেরা মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার সুযোগ পেয়েছিল।

রক্তক্ষয়ী ওহুদ রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ (সা:) মুশরিকদের চতুর্মুখী নির্মম আঘাতে ভীষণভাবে রঞ্জিত হন। সাহাল বিন সাদ বলেন, ফাতেমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর জখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন, আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতেমা (রাঃ) যখন দেখলেন পানি রক্ত পড়া বন্ধ না করে বৃদ্ধি করছে তখন তিনি এক টুকরা চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে লাগিয়ে দিলেন। তখন রক্ত বন্ধ হলো, সেদিন রাসূল (সাঃ) এর ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, চেহারা জখম হয়ে গিয়েছিল এবং লৌহ শিরস্ত্রান ভেঙ্গে মস্তকে বিদ্ধ হয়েছিল। অভিশপ্ত উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস নবী করিম (সাঃ) এর নীচের ঠোঁটও রক্তাক্ত করেছিল। (বুখারী হাদীস নং-৪০৭৫)

উহুদ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ উপেক্ষা করে আনুগত্যহীন হওয়ায় রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় চাচা বীর শহীদ হামযা (রাঃ) এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গহীন ক্ষত বিক্ষত লাশসহ সত্তর জন রাসূল (সাঃ) এর সাহাবী করুণভাবে শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিবে কিয়ামতের দিন তার কোন হুজ্জাত বা প্রমাণ থাকবে না। (মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং ৫৭১৮ ছহীহ সনদ)

অনুসরণীয় আনুগত্যের উদাহরণ ঃ

১. আবু বকর (রাঃ) এর গারে সাওরের লোমহর্ষক ঘটনা।

২. উমর (রাঃ) এর নির্দেশ পালনে খালিদ (রাঃ) এর আনুগত্য।

৩. হুদায়বিয়ার সন্ধিস্থলে আবু জান্দাল (রাঃ)-এর উপস্থিতি। (আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা- ৩৬৮)

আনুগত্যের সীমারেখা ঃ

১) নিজের পছন্দ-অপছন্দ সকল ক্ষেত্রে আনুগত্য করা ফরয। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৭০৫৪)

২) স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৫৫)

৩) ব্যক্তির আনুগত্য করা হবে না। (নেতৃত্ব চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু আনুগত্যের কোন পরিবর্তন হবে না)।

কাদের বা কীসের আনুগত্য করতে হবে:

১. আল্লাহ, রাসূল, নেতা
২. সংবিধান, ঐতিহ্য, কর্মনীতি
৩. প্রতিনিধি, চিঠি, সার্কুলার, ঘোষণা
৪. সাংগঠনিক পদ্ধতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত।

আনুগত্যের পদ্ধতি:

১) নিজের উদ্দেশ্যে জানতে হবে।
২) ভালোভাবে কাজ বুঝতে ও শ্রবণ করতে হবে।
৩) কাজের বিষয়গুলো ভালোভাবে জানতে হবে।
৪) কাজ বেশি হলে সুশৃঙ্খলভাবে ও গুরুত্ব অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।
৫) সাংগঠনিক সার্বিক অবস্থা উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে জানাতে হবে।
৬) কোন বিষয়ে উর্ধ্বতনকে কিছুই গোপন রাখা যাবে না।
৭) সংগঠনের অভ্যন্তরীন বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

আনুগত্য করার পূর্বশর্ত:

১. মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ;
২. দায়িত্বশীলদের প্রতি আস্থা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ;
৩. ভালবাসা, দরদ ও আন্তরিকতা;
৪. কল্যাণ কামনা;
৫. আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা;
৬. স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য;
৭. কৃত্রিমতা ও আনুষ্ঠানিকতা পরিহার;
৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশা করা;
৯. সুসময় ও দুঃসময়ের পার্থক্য না করা;
১০. ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্য পরিবর্তিত না হওয়া।

কর্মী ও দায়িত্বশীলের করণীয়:

১. কর্মীর দায়িত্ব হলো নিজের সমস্যার চেয়ে সংগঠনকে গুরুত্ব দেয়া;
২. নেতার দায়িত্ব হলো কর্মীর সমস্যাকে মূল্যায়ন করা।

আনুগত্যের ক্ষেত্রে বর্জনীয়:

১. খিটখিটে মেজাজ;
৩. তর্ক-বিতর্ক;
২. দায়িত্বশীল, প্রতিনিধি বা সংবাদদাতার কাছে রাগ প্রকাশ।

আনুগত্যের গুণাবলি:

ক) শুধুমাত্র আল্লাহর খুশির জন্য কাজ করা।
খ) সকল অবস্থায় মানসিক প্রস্তুতি রাখা।
গ) ছোট-বড় সকল কাজকে সমান গুরুত্বের সাথে দেখা।
ঘ) সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ ও আন্তরিকতার সাথে পালন করা।
ঙ) কোন কাজকেই অবহেলায় ফেলে না রাখা।
চ) আস্থাসহ আনুগত্য করা।
ছ) নেতা ও কর্মীদের জন্য পারস্পরিক দু'আ অব্যাহত রাখা।

কীসে আনুগত্য নষ্ট করে/আনুগত্যের পথে অন্তরায়:

১. আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াকে অগ্রাধিকার;
২. আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অসচেতনতা;
৩. গর্ব-অহংকার;
৪. হিংসা-বিদ্বেষ;
৫. সিনিয়রিটি-জুনিয়রিটি মনোভাব;
৬. মেজাজের ভারসাম্যহীনতা;
৭. পদের প্রতি লোভ;
৮. দায়িত্বশীল পছন্দ না হওয়া;
৯. মান উন্নয়নে বিলম্ব;
১০. দায়িত্বশীলদের সাথে সম্পর্কের তিক্ততা;
১১. সন্দেহ প্রবণতা;
১২. মতামতের কুরবানী করতে না পারা;
১৩. হৃদয়ের বক্রতা;
১৪. মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্ন;
১৫. বন্ধু-বান্ধবদের দাবি পূরণ;
১৬. পরিবার-পরিজনের চাপ;
১৭. নিজকে অতীব যোগ্য মনে করা;
১৮. হৃদয়ের বক্রতা;
১৯. অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ;
২০. বংশীয় আভিজাত্য ও পজিশন/অবস্থানগত তারতম্য;
২১. সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী মন-মানসিকতা।

আনুগত্য পেতে হলে একজন দায়িত্বশীলদের করণীয়:

১. কর্মীদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ;
২. জনশক্তিকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সংগঠন বুঝতে প্রেরণা দেওয়া;
৩. কর্মীদের প্রতি নম্র, কোমল ও রহমদিল হওয়া;
৪. অধস্তন ভাইদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা; (আল আরাফ, আয়াত নং-১৯৯)
৫. সহযোগীদের সাথে পরামর্শ করা;
৬. সাংগঠনিকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তে অটলতা;
৭. কর্মী ভাইদের জন্য দোয়া করা এবং পরস্পর অগ্রাধিকার দেয়ার চর্চা করা।

পরিবেশ তৈরি করায় ইসলামী সংগঠনে পরামর্শ:

"হে নবী! কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। কোন বিষয়ে আপনার পরিকল্পনা সুদৃঢ় হয়ে গেলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন।" (বাকারাহ-১৫৪)

পরামর্শ কী?

পরামর্শ শব্দের শাব্দিক অর্থ হল মতামত দেওয়া, মত বিনিময় করা। একে আরবিতে বলে 'শূরা'। ইংরেজিতে বলে কাউন্সিল, এডভাইস।

পরামর্শের গুরুত্ব:

১. পরামর্শ দেওয়া আল্লাহর নির্দেশ (ইমরান-১৫৯)
২. পরামর্শ করা বিশ্বনবী (সাঃ)-এর সুন্নাত (তিরমিযী)
৩. পরামর্শ করা সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য (আশ-শূরাঃ ৩৮)
৪. পরামর্শ হচ্ছে আন্দোলনের নিরাপত্তা প্রহরী (আল মু'জামুস সগীর)
৫. পরামর্শে আল্লাহর রহমত থাকে
৬. পরামর্শ স্বেচ্ছাচারী হবার পথ রুদ্ধ করে
৭. ওহী ও নবীর অবর্তমানে জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য পরামর্শ জরুরী

৮. পরামর্শ চিন্তার ঐক্য সাধন করে (আবু দাউদ)

৯. পরামর্শ দুনিয়ার জীবনেরও কল্যাণ ও সৌভাগ্যের উৎস। (তিরমিযী)

উম্মুল মোমিনীন আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি, যিনি রাসুল (রাঃ) এর চাইতে বেশি পরামর্শ করতেন। (তিরমিযি)

পরামর্শ যারা দেবেন বা যাদের সাথে পরামর্শ করবেন

১. সর্বসাধারণের পরামর্শ

২. দায়িত্বশীলবৃন্দের পরামর্শ

৩. আহলে রায় বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

৪. মুরুব্বী সংগঠনের সাথে পরামর্শ

পরামর্শ দেওয়ার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী:

১. কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেওয়া;

২. দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ চাওয়া;

৩. মার্জিত ভাষায় পরামর্শ দেওয়া;

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ দেওয়া;

৫. পরামর্শ গৃহীত হল কিনা তা বিবেচনা না করে পরামর্শ দেওয়া;

৬. পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে গ্রুপিং না করা;

৭. ক্ষতিকর পরামর্শ না দেওয়া (আবু দাউদ);

৮. সামষ্টিক মতের কাছে নিজের মতের কুরবানী দেওয়া (বায়হাকী);

৯. নিজের মতের বিপরীত সিদ্ধান্ত হলে তা বাইরে প্রকাশ না করা।

ইহতিসাব কী?

ইহতিসাব শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো, গঠনমূলক সমালোচনা বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা।

ইহতিসাবের গুরুত্ব:

১. আল্ কোরআনের নির্দেশ।

২. সংগঠনকে গতিশীল করে।

৩. গীবতের পথ বন্ধ করে (হুজরাত-১২)।

৪. সন্দেহ প্রবণতা দূর করে (হুজরাত-১২)।

৫. মানুষ মাসুম বা নিষ্পাপ নয়।

ইহতিসাবের উদ্দেশ্যঃ

أ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (সূরা হুদ : ৮৮)

১. অপরের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার জন্য;

২. অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনায়;

৩. সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য।

ইহতিসাবের পদ্ধতিঃ

১. ব্যক্তিগতভাবে একে অপরকে সংশোধনের চেষ্টা করা;
২. সংশোধন না হলে দায়িত্বশীলকে জানানো;
৩. তাতেও যদি সংশ্লিষ্ট ভাই সংশোধিত না হন, তাহলে দায়িত্বশীলের অনুমতি সাপেক্ষে সামষ্টিক প্রোগ্রামে ইহতিসাব করা।

ইহতিসাব করার নিয়ম-নীতিঃ

নিয়ম-নীতির ধার না ধরলে ইহতিসাব দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকারটাই বেশি হবে। হাদীসে মুমিনকে মুমিনের জন্য আয়না বলা হয়েছে। (তিরমিযী) তাই, অন্যের সংশোধনের জন্য আমাদেরকে আয়নার মতো ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন-

১. ইহতিসাব করার পূর্বে আন্তরিক ভাবে পরামর্শ প্রদান;
২. কারো ছিদ্রান্বেষণ বা দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো উচিত নয়;
৩. পিছনে বসে সমালোচনা করা যাবে না;
৪. সমালোচনায় কোন বাড়াবাড়ি হওয়া উচিত নয়;
৫. সমালোচনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধি ও দুরভিসন্ধি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত;
৬. বক্তব্যটুকু বলে দেওয়ার পর তাকে আর মনের মধ্যে লালন করা উচিত নয়;
৭. সকলের ভিতর পরনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও ভালবাসা ক্রিয়াশীল থাকতে হবে।

কোন মুসলমান তার ভায়ের কথা বা কাজের দ্বারা মনঃকষ্ট পেলে তা থেকেই অভিযোগের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের যত্নবান থাকতে হবে।

১. এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে অভিযোগের সুযোগ না দেয়া;
২. অভিযোগ সৃষ্টি হলে তা অবিলম্বে অন্তর থেকে দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা;
৩. উক্ত প্রচেষ্টার পরও অভিযোগ সৃষ্টি হলে এবং তাকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর না হলে তাকে মনের ভিতর লালন না করে অবিলম্বে ভাইয়ের কাছে প্রকাশ করা;
৪. অভিযোগকারী পিছনে গীবত না করে সংশোধনের সুযোগ করে দেয়ার কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে কৃতজ্ঞ হওয়া;
৫. ভাইয়ের মনে কোন অভিযোগ রয়েছে, একথা জানার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসংশোধনের চেষ্টা করা, যদি সত্যিই নিজের ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে খোলা মনে স্বীকৃতি জানানো ও অনুশোচনা প্রকাশ করা;
৬. সে ত্রুটির জন্য কোন ওযর থাকলে তা পেশ করা;
৭. মুসলমান ভাই তার ত্রুটি স্বীকার করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

ইসলামী সংগঠনের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব, আনুগত্যশীল কর্মীবাহিনী, পরামর্শ বা শুরা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উদারচিত্তে ইহতিসাব বা গঠনমূলক সমলোচনার মাধ্যমেই মূলত সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ভীত সুদৃঢ় হয়। কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। ফলে সংগঠন তার উদ্দীষ্ট লক্ষ্য পানে দ্রুতগতিতে ধাবমান হতে থাকে। উল্লিখিত বিষয়গুলি একটির সাথে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সুতরাং, একটি আদর্শ সংগঠনের কর্মীদের জন্য উপরের প্রত্যেকটি বিষয় সঠিকরূপে পালন করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংগঠন তার গতিপথ হারিয়ে ফেলবে।

পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা

মোহাম্মদ হোদয়েত উল্লাহ

প্রথম কথা

পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যত পালনীয় কর্মপন্থার মানসিক প্রতিচ্ছবি। পরিকল্পনা বর্তমান ও ভবিষ্যত সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে।

পরিকল্পনা কী

পরিকল্পনা হলো- Planning is what to be done, when is to be done, how is to be done and who is to do it.

পরিকল্পনা বলতে আমরা বুঝি- Planning is a trap to capture the future,

কিংবা পরিকল্পনা হলো- Planning is deciding in advance what is to be done.

মোট কথা পরিকল্পনা মানে- Five Ws Guess how এর উত্তর খুজে বের করা। যেমন-

১) Why must it be done?
২) What action is necessary?
৩) Where will it take place?
৪) When will it take place?
৫) Who will do it?
৬) How it will be done?

মনে রাখতে হবে

পরিকল্পনা হলো- Planning is an intellectually demanding process.

১) উন্নতমানের বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া
২) বিবেচনা প্রসূত কর্মপন্থা নির্ধারণ
৩) উদ্দেশ্য, ঘটনা ও হিসেবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

১) ভবিষ্যতমুখিতা (Futurity)
২) নমনীয়তা (Flexibility)
৩) বাস্তবমুখী (Reality oriented)
৪) তথ্যনির্ভর (Information based)
৫) লক্ষ্যনির্ভর (Goal oriented)
৬) নিরবচ্ছিন্নতা (Continuity)
৭) সঠিক বিকল্প গ্রহণ (Selection of proper alternative)
৮) সময়ানুগ (Time based)
৯) ইচ্ছা তালিকা (Wish list)
১০) কার্যফাদ (Activity trap)
১১) পরিকল্পনার ব্যাপ্তি (pervasiveness of Planning)

পরিকল্পনার গুরুত্ব

১) সংগঠনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
২) অনিশ্চয়তা দূরীকরণ
৩) সমন্বয়ে সাহায্য করে
৪) নানাবিধ সমস্যার সমাধান
৫) নিয়ন্ত্রণে সহায়ক
৬) ভারসাম্য রক্ষা
৭) দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীভূতিকরণ
৮) সীমিত জনশক্তির সঠিক ব্যবহার
৯) Answers 'what if' question
১০) গতিশীল নেতৃত্ব
১১) দক্ষতা বৃদ্ধি

পরিকল্পনার প্রকারভেদ

১. প্রকৃতিগত শ্রেণী বিভাগ
২. সংগঠন কাঠামোগত শ্রেণী বিভাগ
৩. মেয়াদভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

ক)
১. লক্ষ্য (Goal)
২. স্থায়ী পরিকল্পনা (Standing plan)
৩. একার্থক প্যান (Single use plan)

খ)
১. কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা
২. বিভাগীয় পরিকল্পনা
৩. আঞ্চলিক পরিকল্পনা
৪. সামগ্রিক পরিকল্পনা

গ)
১. দীর্ঘমেয়াদী
২. মধ্যমেয়াদী
৩. স্বল্পমেয়াদী
৪. তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা

পরিকল্পনা যেসব কারণে ব্যর্থ হয়

১. অবাস্তব ও অধিক সংখ্যক লক্ষ্য নির্ধারণ
২. সঠিক কর্মকৌশল ও কর্মপন্থা নির্ধারণ
৩. দৈনন্দিন কার্যক্রমে পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করা
৪. সৃজনশীলতা মুক্ত পরিকল্পনা

৫. সকলের জন্য আদর্শ মানসম্পন্ন পরিকল্পনার অভাব
৬. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাকে অধিক গুরুত্বারোপ।

বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন

১. লেগে থেকে কার্য সম্পাদন
২. নিজে সম্পৃক্ত থাকা
৩. অন্যের কাজের স্বীকৃতি প্রদান
৪. জনশক্তিকে বোঝাতে হবে অতিরিক্ত কাজ বোঝা নয়, বরং নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ
৫. A-Z কাজের তত্ত্বাবধান
৬. প্রাপ্তিতে উল্লসিত কিংবা পরাজয়ে ভেঙে পড়া যাবে না
৭. আমাদের যোগ্যতার চেয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা বেশি রাখতে হবে।

আর মনে রাখতে হবে আমাদের যোগ্যতা কিংবা দক্ষতা বড় কথা নয় বরং পেরেশানি থাকতে হবে অর্জিত ফলাফলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

ব্যবস্থাপনা

১. আধুনিককালে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সমস্যা সমাধানের একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া
২. দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যাক্তির কার্যাবলি ও চেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন তথা ভারসাম্য আনয়নের জন্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই
৩. একদল ব্যক্তিকে তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করার প্রক্রিয়াই হলো ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনা বলতে আমরা কি বুঝি?

'To train up the horses' an act of guiding or lading অর্থাৎ (management)। to manage men tactfully – কৌশলে মানবসম্পদ পরিচালনা।

Management এর জন্য ৬গ জরুরি।
Men. Mechanisms. Materials. Money. Market. and Method.

মোট কথা ব্যবস্থাপনা হচ্ছে- Management is an art of getting things to me by others.

ব্যবস্থাপনার কাজ ৪টি

১. Planning
২. Organizing
৩. Leading
৪. Controlling

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

১. জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার
২. সুন্দর কাজের পরিবেশ তৈরী
৩. জনশক্তির মানোন্নয়ন
৪. দায়িত্বশীল জনশক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ
৫. একযোগে সকল জনশক্তিকে কাজ দেয়ার জন্য
৬. ভারসাম্য তৈরি করে তা প্রতিষ্ঠাকরণ
৭. দক্ষতা বৃদ্ধি

ফলপ্রসূ যোগাযোগঃ ব্যবস্থাপকের কাজ

১. পরিকল্পনা প্রণয়ন
২. তত্ত্বাবধান
৩. সমন্বয়
৪. পরিদর্শন
৫. মূল্যায়ন
৬. মধ্যস্থতাকারী
৭. বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান

ব্যবস্থাপকের গুণাবলি

১. শারীরিক গুণ
২. মানবিক গুণ
৩. নৈতিক গুণ
৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা
৫. কার্য সম্পর্কে ও কৌশলগত জ্ঞান
৬. অভিজ্ঞতা (অর্জিত জ্ঞান)

এছাড়াও সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞান, আত্নবিশ্বাস ও দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধতা, দূরদর্শিতা, সাহসী ও ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা, উদ্যম ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা, নমনীয়তা, ধৈর্য, নেতৃত্ব, সহযোগীতামূলক মনোভাব, অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা, আত্নমর্যাদা, বন্ধুভাবাপন্ন, সৌহার্দ্যপূর্ণ, অন্যের মতামত বোঝা ও গ্রহণে আন্তরিক, আত্মকর্মের সমালোচনা, কুশলী, মার্জিত রুচিবোধ সম্পন্ন, উৎসাহ দানের যোগ্যতা।

সরকারি তথ্য ও সেবা ৩৩৩
দুদক ১০৬
জরুরি সেবা ৯৯৯
দুর্যোগের আগাম বার্তা ১০৯০
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯

শুব্বানের ৮ম সেশনের মাসলিসে ক্বারার দায়িত্বশীলবৃন্দের পরিচিতি

ক্র.নং	নাম	পদবি	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী জেলা	মোবাইল নং	ই-মেইল
১	মো: রেজাউল ইসলাম	সভাপতি	ঢাকা	গাইবান্ধা	০১৭১৭৬৩০৮৯৯	rezadu10@gmail.com
২	ইসহাক বিন ইরশাদ	সহ-সভাপতি	ঢাকা	বগুড়া	০১৭২৭৫৬৯২১৪	ishaquebogra@gmail.com
৩	মুহা: আনিসুর রহমান	সহ-সভাপতি	ঢাকা	বগুড়া	০১৭৬৫৮২২৯৮১	anusbd@gmail.com
৪	মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	সাধারণ সম্পাদক	বগুড়া	রংপুর	০১৭১৪৮৮১৩৬৯	al.fmdu13@gmail.com
৫	রবিউল ইসলাম	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	ঢাকা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০১৭২৩৩০৬৮৮০	rabiulrabiislam@gmail.com
৬	হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিস	কোষাধ্যক্ষ	ঢাকা	নরসিংদী	০১৬৭৬২৭৭০৪৫	abdullahbinharish@gmail.com
৭	তানযীল আহমাদ	সাংগঠনিক সম্পাদক	ঢাকা	নীলফামারী	০১৭৪৮৭৬৭৯২৫	tanzilahmad.bd96@gmail.com
৮	আব্দুল্লাহিল হাদী	প্রচার- প্রকাশনা সম্পাদক	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও	০১৭২২৫৬৮২৮০	ahadi8891@gmail.com
৯	আব্দুল মতীন	শিক্ষা ও গবেষণা	ঢাকা	দিনাজপুর	০১৯১৪৫১৫৫০০	arabic07.ru@gmail.com
১০	মো: আব্দুল হাই	সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	নরসিংদী	গাইবান্ধা	০১৭৩৭৫১২৪৯৩	abdulhye.kpl@gmail.com
১১	রায়হান কবীর	ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল	০১৯২০৬০৯৬৮৫	raihankabir2071@gmail.com
১২	আহমাদুল্লাহ	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	রাজশাহী	রাজশাহী	০১৭২৩২৮৬৩৬২	ahmudullah6263@gmail.com
১৩	ইসমাইল হোসেন	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পাদক	নারায়ণগঞ্জ	রাজশাহী	০১৭১৫৪০৮৮৫৪	ismail244342@gmail.com
১৪	হুমায়ূন কবীর	তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	যশোর	যশোর	০১৭১০৭৮৭৮৬৮	humayunezazz@gmail.com
১৫	ইমাম হাসান	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	মদীনা বিশ্ব:	নরসিংদী	০১৯২০০৭৪৮০৪	imam.hasanarabi@gmail.com
১৬	আসাদুল্লাহ আল গালিব	আইন বিষয়ক সম্পাদক	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা	০১৯১১৮১৮৪৩৩	asadullahalgalib433@gmail.com
১৭	হাফেয আশিক বিন আশরাফ	দফতর সম্পাদক	ঢাকা	সিরাজগঞ্জ	০১৭৪১৫৩০১৭৪	ashicbinashraf@gmail.com
১৮	মো. ইসরাফিল হোসেন	পাঠাগার সম্পাদক	ঢাকা	রাজশাহী	০১৭১৬৬০৩৩৪৬	israfil1985@gmail.com

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য ০৩ জন

ক্র.নং	নাম	পদবি	বর্তমান ঠিকানা	নিজ জেলা	মোবাইল নং	ই-মেইল ঠিকানা
১	ফারুক আহমাদ	মজলিসে ক্বারার সদস্য	জয়পুরহাট	গাজীপুর	০১৭৪৮০৩০৫৮১	infofaruquebd@gmail.com
২	শরীফুল ইসলাম	মজলিসে ক্বারার সদস্য	ঢাকা	সিরাজগঞ্জ	০১৭৬২৬৭৪৭২৯	sharif.bm84@gmail.com
৩	মো: তাকীউদ্দিন	মজলিসে ক্বারার সদস্য	ঢাকা	গাইবান্ধা	০১৭৪১৬৯২০৮৫	takiuddin.bd@gmail.com

শুব্বান সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য ০২ জন

ক্র.নং	নাম	পদবি	বর্তমান ঠিকানা	নিজ জেলা	মোবাইল নং	ই-মেইল
১	মামুন উর রশীদ	মজলিসে ক্বারার সদস্য	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৩৭৯১৪৯৩	shadhajj@ymail.com
২	মুহা. মাসউদুর রহমান	মজলিসে ক্বারার সদস্য	নরসিংদী	জামালপুর	০১৯২৪৮৮২৭২৫	mdmasudurrahman708@gmail.com

উপদেষ্টা পরিষদ

ক্র.নং	নাম	পদবি	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী জেলা	মোবাইল নং	ই-মেইল
১.	মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন	প্রধান উপদেষ্টা	রাজশাহী	রাজশাহী	০১৭১৬০১১০৭৯	
২.	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর	সদস্য	ঢাকা	ঢাকা	০১৭১১৫৪৪২৬৪	
৩.	চৌধুরি মুমিনুল ইসলাম	সদস্য	ঢাকা	বরিশাল	০১৯১৬৭০০৮৬৬	
৪.	মো:রেজাউল ইসলাম	সদস্য	ঢাকা	গাইবান্ধা	০১৭১৭৬৩০৮৯৯	
৫.	আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	সদস্য	বগুড়া	রংপুর	০১৭১৪৮৮১৩৬৯	

শীঘ্রই প্রকাশ হচ্ছে...

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানীত উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি **প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম** রচিত সাপ্তাহিক আরাফাতের ২৬ পর্বে প্রকাশিত

উপমহাদেশে আহলে হাদীসের ইতিহাস

প্রকাশনায়:

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

মোবা: ০১৭৪১৫৩০১৭৪, ই-মেইল: src.subbanbd@gmail.com

শীঘ্রই আসছে...

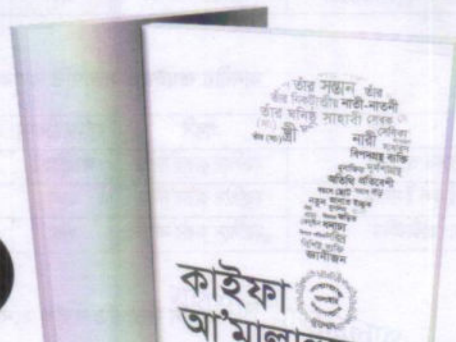

একটি সীরাত গ্রন্থ

অনুবাদক
মোঃ রেজাউল ইসলাম

প্রকাশনায়:

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

মোবা: ০১৭৪১৫৩০১৭৪, ই-মেইল: src.subbanbd@gmail.com

সাংস্কৃতিক কর্মশালা

ভর্তি চলছে ২০২০

এসো সত্যের পানে শেকড়ের সন্ধানে

প্রশিক্ষণের বিষয় সমূহ:

কুরআন বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত
হামদ্-নাত ও ইসলামী সংগীত

নিয়মিত ক্লাসে শিশু কিশোর এবং বড়দের ভর্তির সুযোগ !

প্রশিক্ষকবৃন্দ:

এস এম মঈনুল ইসলাম, আলমগীর কবির
নজরুল ইসলাম, ওয়াসিম আকরাম, মুহসিন আলম
ফয়েজ আহমাদ ও ওমর ফারুকসহ
শেকড় এর শিল্পীবৃন্দ।

কর্মশালা শেষে সেরাদের নিয়ে অ্যালবাম প্রকাশের সুযোগ !

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:

কেন্দ্রীয় শুব্বান

ক্লাস
শুক্রবার সকাল ৯টা

এছাড়াও সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী মেধাবী শিল্পীদের জন্য শেকড়ে রয়েছে বিশেষ অগ্রাধিকার !

স্থান: জমঈয়ত ভবন
৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

ভর্তি ফরম সংগ্রহ ও বিস্তারিত তথ্য জানতে
০১৮৩৮-৭৭০৬৪৪
০১৭৩০-৬৪৮১৬৪

শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার
কার্যক্রম :
- অনুবাদ
- গবেষণা
- বই প্রকাশ
- অনলাইন দাওয়াহ্

যোগাযোগ:
পরিচালক: ০১৭১৯-১১৬৫৬৫
যুগ্ম পরিচালক: ০১৯১৪-৫১৫৫০০
উপ-পরিচালক: +৯৬৬ ৫৫২৫৯৩৫৬৮
সদস্যবৃন্দ: ০১৭২২-৫৬৮২৮০
০১৭৪৮-৭৬৭৯২৫
+৯৬৬ ৫০০৮৫৮৪৩৬
সচিব : ০১৭৪১-৫৩০১৭৪

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
src.shubbanbd@gmail.com

Design & Printed by: pixel GRAPHICS & PRINTERS 01757672696